অথ বর্মা কথা

অনন্যা পাল

অনন্যা পাল

অথ রম্যকথা

অথ রম্যকথা

অনন্যা পাল

“ভালোর ভালো বলে এই দুনিয়ায় কিছুই তো নাই।
মন্দের ভালোই সত্যিকারের ভালো।
তাই নিয়েই খুশি থাকতে হয়।“
শিবরাম চক্রবর্তী

এই বইটি, প্রবাদপ্রতিম হাস্যরসিক ও
সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ।

সূচি

বইটি সম্পর্কে দু-চার কথা

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে স্বভাবতই আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে ব্যস্ততাময় ও জটিল; সহজ সরল প্রাণখোলা হাসির অবকাশ সেখানে কম। কিন্তু ভালো থাকার পেছনে এই হাসির অবদান একবাক্যে স্বীকার করবেন সকলেই; সমাজে যখন ডিপ্রেশান এক গভীর ও দ্রুত বিস্তার প্রাপ্ত ব্যাধি, হাসির প্রয়োজন সেক্ষেত্রে বেড়েছে বই কমে নি। হাসির গল্প বা রম্য রচনার আঙ্গিক অনেকরকম হতে পারে, তবে নিজেকে নিয়ে হাসতে পারা আমার ব্যক্তিগত পছন্দের, হয়তো এতেই আমি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ। সেকারণেই, এই বইয়ের প্রথম আঠেরোটি গল্প আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, তা সে নিজের দেশে, অথবা বিদেশে থাকাকালীন বা কোথাও বেড়াতে গিয়েই হোক। আশা রাখি আমার মত আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালীও গল্প গুলির সাথে একাত্ম বোধ করবেন। বইয়ের প্রথম (কণিষ্ক), পঞ্চম (কুল না ফুল), ষষ্ঠ (রাগে অনুরাগে) ও বিংশতম (আলাপচারিতা) গল্পগুলি আমার ঢাকায় থাকাকালীন ওখানকার বিখ্যাত 'প্রথম আলো' দৈনিকপত্রিকায় বেরিয়েছিল।

বইয়ের বেশ কয়েকটি গল্প আমার বেড়ানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা; যেমন 'বাহারে সমুদ্রবিহার', 'জঙ্গল সাফারি ও গদাযুদ্ধ', 'মাসাইয়ের জঙ্গলে', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দুম্', 'কিমোনো কথা' ও 'হরিণে হরিল হৃদি'। এই গল্পগুলি রম্যরচনার গণ্ডী পেরিয়ে ভ্রমণগদ্যও বটে, হয়তো ভ্রমণপ্রিয় পাঠকেরা এগুলিতে সেই অতিরিক্ত স্বাদ পাবেন।

বইয়ের শেষ গল্প 'দশ এক্কে দশ' দশটি পরস্পর জড়িত গল্পের সমাহার, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে। খানিকটা পরীক্ষামূলক ভাবেই এর প্রথম তিনটি গল্প লিখেছিলাম, যা নবকল্লোলএ ডিসেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; পরে বাকি সাতটি গল্প তার সাথে জুড়ে একটি ঘটনাবৃত্তকে সম্পূর্ণ করি।

চিত্রাঙ্কণ যোগে গল্পগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস; আমার এই ভাবনা কে সযত্নে বাস্তবায়িত করেছেন প্রকাশক ও অঙ্কণ শিল্পী, তাঁদের কাছে এর জন্যে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এই বইটির পাঠকমণ্ডলীর কাছেও, তাঁদের উৎসাহেই ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবার স্পর্ধা রাখি।

অনন্যা পাল

কনিষ্ক

সে বেশ অনেক কাল আগের কথা, তখন স্কুলে পড়ি...

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ, পচা গরমে শরীর হাঁসফাঁস। অভিজাত স্কুলের গাছপালা ঘেরা খোলামেলা বিল্ডিং তাই রক্ষে; তবে গরমের ছুটির আর মোটে দিন দুয়েক অপেক্ষা তার পর আর পায় কে! টেনের ক্লাসরুমে বসে একমনে পেন্সিল চিবুতে চিবুতে সে কথাই ভাবছিলাম। সদ্য শেষ হওয়া হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা টাতা বেরচ্ছে তাই বেশ একটা চাপা উত্তেজনা, আমি অবশ্য 'রাগ দুঃখ ভয় তিন থাকতে নয়' গোছের দর্শনে বিশ্বাসী তাই আপাতত মা টিফিনে কি দিয়েছে সেই নিয়ে গবেষনায় ব্যস্ত। ইতিহাসের দিদিমণি মিসেস রয় ক্লাসে ঢুকলেন, হাতে যথারীতি উত্তরপত্রের গোছা।

'এগুলো তোমাদের নয়, তোমরা কাল পাবে' ব্যক্তিত্বময়ী সদাপ্রসন্না দিদিমনি আজ মনে হোল তেমন প্রসন্ন নন।

নিজের জায়গায় বসে গম্ভীর মুখে জানতে চাইলেন X-A র মিতালী বসু কে চেন তোমরা?' চুপচাপ নিরীহ মিতালী হঠাৎ এত বিখ্যাত কি করে হোল ভাবার চেষ্টা করছি, দিদি নিজেই ব্যাপারটা খোলসা করলেন।

'একটু আগে মিতালীর খাতা চেক্ করছিলাম, তাই ওর সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করছি।'

আমি তো শুনে থ! মিতালী তো জানতাম পড়াশোনায় আমার থেকেও সরেশ, এর আগে আমরা এক সেকশানে পড়েছি; কলিকালে কত কি যে দেখব!

'তোমাদের এখন মিতালীর খাতা থেকে সম্রাট কনিষ্কের ওপর যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তর পড়ে শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনে বলবে কি বুঝলে।' উত্তেজনায় এবং খনিক ঈর্ষায় আমার পেটের ভেতর গুড়গুড়, যাই হোক দিদিমণি তাঁর উদ্দাত্ত গলায় শুরু করলেন।

'কনিষ্ক অনেক দিক থেকেই আর সব সমকালীন রাজার থেকে আলাদা ছিলেন এবং তার প্রথম কারণ হল তিনি মুণ্ডহীন ছিলেন। মুণ্ডহীন হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিতে ও পরাক্রমে অন্য মুন্ডওয়ালা রাজাদের থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রু তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলত, বিনা মুণ্ডেও তিনি অর্জুনের মতই লক্ষভেদ করতে পারতেন। শুধু তাই নয় মুণ্ডহীনতা সত্ত্বেও তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। শুধু একটা বিষয়েই তাঁর বিশেষ অসুবিধে ছিল, মুণ্ড না থাকায় সম্রাটের মুকুট মাথায় পরার সুবিধে ছিল না, তবে মনে হয় সেটা তিনি কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে কাজ চালিয়ে নিতেন।'

বাকিটা শোনার মত অবস্থা তখন ক্লাসের কোনও মেয়েরেই আর নেই, উদ্বেলিত হাসি চাপার অসীম চেষ্টায় সকলের মুখ লাল। আমি মনে মনে ক্ষনজন্মা মিতালী কে স্যালুট না জানিয়ে পারলাম না। শুধু দিদিমনির মুখে থমথমে গাম্ভীর্য।

'এটা কি আমাকে অপমানের চেষ্টা?' উনি দেখলাম ব্যাপারটা ব্যাক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। নিরীহ, ল্যাকপ্যাকে মিতালীকে আর যাই হোক ঠিক অপমানকারিনী হিসেবে ভাবতে পারলাম না।

***

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, সম্রাট কনিষ্কের একটি মাত্র প্রতিকৃতি মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, সেটি কালের প্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মুণ্ডহীন ছিল। ফলে ইতিহাসের বইয়ে তাঁর যে ছবি পাওয়া যায়, সেটি সেই মুণ্ডহীন ধরের প্রতিকৃতি।

রঙবাহার
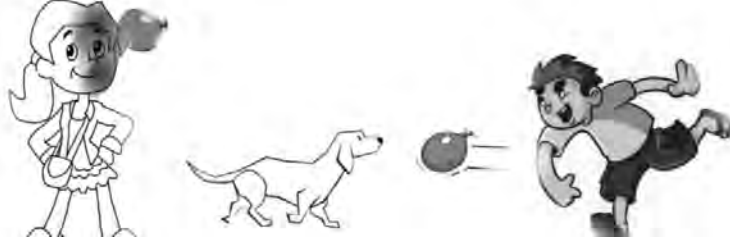
সদ্য ক্লাস এইটে উঠেছি, স্কুলের ছোট ক্লাসের মেয়েরা এরমধ্যেই বেশ মান্যি গন্যি করতে শুরু করেছে আমাদের; তাই তাদের সামনে গ্রাম্ভারি চালে নিজের কেউকেটা ভাবটা চাগিয়ে রাখি সবসময়। আমি আর সীমা একই সেকশান, পাশাপাশি পাড়ায় থাকি, হেঁটেই যাতায়াত করি স্কুলে একসাথে। আমাদের দুই বন্ধুতে অনেক ব্যাপারেই ভারি মিল, যেমন পরীক্ষার হলে বসে পেন চিবানো, রেজাল্ট বেরোলে উদাসী দার্শনিক হয়ে যাওয়া; ক্লাসে পড়া দেবার সময় মৌনিবাবা আর টিফিন টাইমে বক্তিয়ার খিলজি হয়ে ক্লাস কাঁপানো। তবে অমিলও একটা আছে, ফরসা টোপা টোপা গাল আর দুটো বিনুনিতে সীমা ভারি সুন্দরী, আর সেকথা জানে বলেই সে চলনে বলনে বেশ পরিপাটি; আমাকে দেখে কেউ অন্ধকারে ভয় পাবে তা হয়তো নয়, তবে মাথার ওপর শিং হয়ে থাকা অসমান দুটো ঝুঁটি আর কুকুরের ন্যাতানো কানের মত দুমড়ানো কলার অলা শার্টে পাগলা দাশুর বোন বলে চালানো যেতে পারে আমায় সহজেই।

তখনও বসন্তের নরম ভাব রয়েছে বাতাসে, গরমটা পড়তে পারেনি সেভাবে; দোলের দিন চুটিয়ে রঙ খেলেছি পাড়ার বন্ধুদের সাথে, সীমা অবশ্য প্রতিবারের মতই লুকিয়ে রইল ঘরে, রঙে ওর বড্ড ভয়। পরেরদিন স্কুলে গিয়ে এই নিয়েই জবর আলোচনা ক্লাসে, কে কত রঙ খেলেছে, কার বাড়িতে কি কি খাবারের আয়োজন ছিল সেসব আরকি। দোল আমার বড় প্রিয় উৎসব, দেদার রঙ খেলা যায় বলে শুধু নয়, পরীক্ষার গুঁতো না থাকায়, বড়দের চোখ রাঙানি থাকেনা, ভালোলাগার সেটাই বড় কারণ; এছাড়া বিকেলে পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোরাসে গলা মেলানোর সুযোগ মেলে আমার মত বেসুরোরও, সেটাই বা কম কিসে! যাইহোক, ছুটির পরে যথারীতি আমরা দুইবন্ধু স্কুল থেকে বেরিয়েছি, গেট পেরিয়ে গলির ভেতর ঢুকেছি শর্টকাট রাস্তা ধরতে রোজের মতই। দেখি সামনের হলুদ একতলা বাড়িটার গেটের ভেতর থেকে ওদের বছর ছয়েকের দেড়ফুটিয়া বিচ্ছু ছেলেটা রাস্তার কুকুর গুলোকে বেলুন ছুঁড়ছে।

রাগ হোল ভারি, হেঁকে উঠলাম 'অ্যাই, কি করছিস?'

'কেন রঙ খেলছি?' পুচকে মহা তর্কবাজ, গুরুজনদের মুখের ওপর জবাব দেয়!

'লজ্জা করেনা? বোবা জীব, কথা বলতে পারেনা তাদের ওপর বেলুন ছুঁড়ছিস? বলব তোর বাড়ীর লোকেদের?' আমরা তেড়ে উঠি ব্যাটাকে সিধে করতে।

এবার একটু ভয় পেয়েছে মনে হোল, আসলে ওর জেঠিমা আমাদের কেমিস্ট্রির টিচার, বদরাগী বলে তাঁকে আমরাও সমঝে চলি।

'আচ্ছা ওদের মারব না আর' মিনমিন করে জবাব দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো ছেলেটা।

আমরা এগোলাম এবার, ছেলেটাকে জব্দ করা গেছে, সেই খুশীতে আমি গলা ছেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছি অখণ্ড মনোযোগে, সীমাও হেসে হেসে তাল দিচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে। কয়েক পা সবে এগিয়েছি হঠাৎ ঠিক কি হোল বুঝতে পারলাম না, কথার ঝোঁকে সীমার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম! আমার দিকে ফেরানো ওর আধখানা মুখ হাবসীদের মত হয়ে গেলো কি করে? হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে বুঝলাম, ঘন সবুজ বাঁদুরে রঙের বাহারেই অমন খোলতাই হয়েছে ওর চেহারা। পেছন থেকে আমাকে তাক করে ছোঁড়া রঙের বেলুন, পিঠের ব্যাগে ধাক্কা খেয়ে রঙ ছড়িয়েছে আমার বন্ধুর ফর্সা মুখে। পেছন ফিরে দেখি দেড়ফুটিয়ে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটছে। ততক্ষণে আমারও রোখ চেপে গেছে, আজ ওর একদিন কি আমার! তেড়ে গেলাম ওকে ধরতে, আমি ওদের বাড়ী অবধি পৌঁছুতে পৌঁছুতে, দেখি আমাদের কেমিস্ট্রি দিদিমনিও এসে পড়েছেন। আমাকে আর পায় কে! বন্ধুর চেহারা দেখিয়ে বললাম সব, সীমাও ফুঁপিয়ে উঠেছে নিজের দশায়; আসলে ওর পেন্সিল বক্সে লাগানো ছোট্ট আয়নায় নিজের মুখটা দেখে ফেলেছে ও ততক্ষণে। দাবার বোর্ডের মত মুখখানা আধা সাদা, আর আধা সবুজ, অন্ধকারে দেখলে ভয় পেতে হোত সন্দেহ নেই। দিদিমণি মহা রেগে ঘেঁটি ধরে টেনে বের করে আনলেন পলায়মান বিচ্ছু সর্দারকে বাড়ির ভেতর থেকে।

'বল এরকম করলি কেন? আজ তোর পিঠে একটা আসত লাঠি ভাঙব!'

'বারে! ওরাই তো বলল কথা বলে যারা তাদের বেলুন মারতে', দিদিমণির বাজখাঁই চিৎকারের জবাবে মিনমিনে জবাব দিলো পুঁচকে।

এরপর একসপ্তাহ স্কুলে যেতে পারেনি সীমা ওই চাঁদমুখ নিয়ে; আমিও আর কোনও পুঁচকেকে ঘাঁটানোর চেষ্টা করিনি ওদিনের পরে।

পিরীতি বিষম জ্বালা

প্রেমে পরাটা বাঙ্গালীদের একটা বাতিকের মত, বিভিন্ন বয়সে সেটা এককেক রকম ভাবে দেখা দেয়। যেমন স্কুলে পরতে ভীতুভীতু প্রেম, আবার কলেজ জীবনে কবিতা লেখার তাগিদে মরীয়া প্রেম। তাছাড়া ধরুন, পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে জানলার পাশে ঘাঁই দিয়ে বসে উদাসী প্রেম; অথবা বাস স্ট্যান্ডে রোজ দেখা মেয়েটির পিছু নিয়ে তার বাড়ী অবধি ধাওয়া করে দুরন্ত প্রেম। এব্যাপারে আপামোর বাঙ্গালিরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে বাধ্য, তার কিছু টক, কিছু মিষ্টি আর কারো কারো কপালে হয়ত শুধুই তেঁতো । তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমার প্রেম বিষয়ক অভিজ্ঞতা শুধু অপূর্ব নয় সম্ভবতঃ অভূতপূর্বও এবং যতরকম প্রেম বাঙ্গালির সহজাত তার প্রায় প্রত্যেকটিই আমার ঝুলিতে বর্তমান।

একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলে ব্যাপারটা বেশ ফরসা হবে। তখন পড়ি ক্লাস সেভেনে, আমার প্রিয় বান্ধবী গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি গিয়ে প্রেমে পরলেন। প্রেমে তো শুধু পরলেই হয়না তাকে জল-সার দিয়ে টিকিয়ে রাখাও চাই; আর সমস্যাটা বাধল সেখানেই। কারণ মামাবাড়ি কোলকাতার বাইরে, পত্রালাপ ছাড়া গতি নেই। এদিকে বাড়িতে চিঠি এলে ধরা পরার ভয়। অতএব অগতির গতি এই শর্মা, বন্ধুর প্রেমকে মসৃণ করার মহৎ কাজে তখন আমাকে ঠেকানো দায়। নিজের বাড়িতে চোরের মত পরের চিঠির আশায় ওঁৎ পেতে থাকি, আর কাঙ্খিত সুগন্ধি রঙিন খামটি এলেই চিলের মত ছোঁ মারি পিওনের কাছ থেকে। এভাবে চলছিলো বেশ; অন্তত আমার বন্ধুর হাবেভাবে তো তাই মনে হোতো, বিপদ এল অন্য দিক থেকে। এক রোববার একটা ফোন আসার পরই বাবা গম্ভীর মুখে ডেকে জানতে চাইলেন কবে থেকে পরের কালোয়াতিতে পোঁ দিচ্ছি? ভাষাটা এক না হলেও বক্তব্যটা প্রায় তাই ছিল। 'প্রাণ যায় পর বচন না যায়' কায়দায় চুপ করে থেকে সেদিন দুর্গতির একশেষ, অন্ততঃ বামাল সমেত ধরা পরা বান্ধিবীর থেকে তো কম নয়ই। যাই হোক এর পর বান্ধবীর প্রেমরোগ তো সারল, কিন্তু আমার?

আমার পোঁ দেওয়ার সেই শুরু, বান্ধবীদের হয়ে অর্ডারি প্রেমের-চিঠি লেখা এবং তার জবাব এলে আরও জুতসই একটা প্রত্যুত্তর দেওয়া আমার সাহিত্যচর্চার (যা কিনা বাঙ্গালির আর এক বাতিক) একটা গুরুতর অঙ্গ হোল; অবশ্য এব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে গাছে ওঠাতে বন্ধুরা কোনও ত্রুটি রাখেনি। তবে আমার সাহিত্যকীর্তি এক অন্য মাত্রা পেল বেশ কিছুদিন পরে। এক বান্ধবী তার অর্ডারি চিঠি আমার থেকে নিয়ে গিয়ে কপি না করে সিধা পাঠিয়ে দিতে লাগলো প্রেমিক প্রবরকে; প্রেমের ব্যস্ততায় নষ্ট করার মত সময়

কোথায়! একদিন সেও চিঠি পাঠানোর আগেই বামাল সমেত গ্রেপ্তার; এক্ষেত্রে গোয়েন্দাটি তার দিদি। চিঠিতে আমার ভুবনমোহিনী হাতেরলেখা চিনতে ভুল হবার নয় আর তা হোলও না। ফলে সেবার প্রানের সাথে কান নিয়েও জবর টানাটানি।

এবার আসি কলেজ প্রেমের কথায়। তখন সবে ফার্স্ট ইয়ার, এক শীতের সকালে আমার বেস্টফ্রেন্ড (বান্ধবী নয়, বন্ধু) হন্তদন্ত হয়ে টেনে নিয়ে গেলো লেডিস কমন রুমের সামনে।

'ব্যাপার কি?' আমি খানিক ভ্যাবাচ্যাকা।

'নন্দিনী এখুনি ঢুকেছে, আমি দেখেছি' বন্ধুর ধোঁয়াটে জবাব।

'তাতে আমাদের কি?'

'আরে অনেক কিছু। শিগগিরই গিয়ে আমার নাম করে ওর ফোন নম্বরটা চেয়ে নে।'

'আমি কেন নিজে নে না' আমার সরব প্রতিবাদ।

'আরে গাধা লেডিস রুমে আমি ঢুকলে সবাই মিলে চামড়া গুটিয়ে নেবে না?'

বন্ধুর যুক্তি অকাট্য, কদিন আগে আমিই এহেন ঘটনার সাক্ষী ছিলাম; বেচারা নতুন পড়ুয়াটি পাশের টিচার্স রুমের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিল। আমি এরপরেও গাঁইগুঁই করছি, প্রধানতঃ নন্দিনীর ডাকসাইটে উন্নাসিকতার কারণে।

'ইয়ে ইশ্‌ক নেহি আসান, এক আগ কা দরিয়া হ্যায়, অউর ডুবকে জানা হ্যায়' বন্ধু গর্জে উঠল।

'কিন্তু ইশ্‌ক তো তোর, আগুনের সমুদ্রে আমি কেন?'

আমার মিনমিনে জবাবের তোয়াক্কা না করে আমাকে ও প্রায় ঠেলে চালান করে দিলো ভেতরে, শুধু তাই নয় দরজার সামনে পাহারায় রইলো যাতে পালিয়ে যেতে না পারি। নিজের বন্ধুভাগ্যে এতদিন পরেও আমি নিজেই রোমাঞ্চিত।

'হাই! আমি সেকশান-এ।'

'জানা আছে', নন্দিনীর কাঠখোট্টা জবাব।

আমি আরেকটু ঘন হবার জন্যে দুএকটা কথা বলি যা নিজের কানেই অত্যন্ত বোকাবোকা ঠেকে। নন্দিনী আমাকে ঝেড়ে ফেলে মন দেয় নিজের সাজসজ্জার দিকে।

'তুমি সুমন্তকে চেন তো? তোমাদের সেক্সানের।' আমি প্রসঙ্গে আসার জন্যে মরিয়া।

'হু কেয়ারস্!'

'না মানে ও তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়।'

'কিন্তু আমি চাইনা।'

'কেন? ও কিন্তু খুব ভালো ছেলে।'

সুপারিশের উত্তরে আমার মাথার পেছনের দেয়ালে চোখ রেখে নন্দিনীর জবাব, 'ভালো মানে তো ক্যাবলা, না হলে এধরনের প্রিমিটিভ ফ্রেন্ড জোটায়!'

কানে আগুন, চোখে জল নিয়ে আমি কমন রুমের বাইরে।

নিজের ইশ্‌ক আসান কিনা জানিনা, তবে বন্ধুর ইশ্‌ক যে পুরোপুরি আগুনের সমুদ্র তা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

হা-চিত্রাঙ্গদা

পুজোর তখনও মাসখানেক বাকী, পাড়ার কাকু আর দাদারা ঠিক করলেন এবার বিজয়া সম্মিলনীটা বড়সড় করে করতে হবে। আসলে, ব্যানার্জী কাকুর ছেলে টুকাইদা এম-বি-এ করে ভালো চাকরি পেয়েছে ব্যাঙ্গালোরে, দাস জ্যেঠুর নতুন ফ্যাক্টরী টাও নাকি চলছে রমরমিয়ে, বাজেটের তাই পরোয়া নেই। প্রথমেই মিটিং বসলো এক রবিবারের বিকেলে, ভুরিভোজ ছাড়াও আর কি কি করা যায় সেই নিয়ে। ডজন কয়েক সিঙ্গারা আর অগনিত কাপ চায়ের সদ্গতি শেষে পাড়ার মাথারা স্থির করলেন, ম্যারাপ বেঁধে ফাংশান হবে; পাশের পাড়ায় প্রতিবারই হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আমরা দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হই। তাই এবার আমরাও, মানে খানিকটা দেখিয়ে দেওয়া গোছের ব্যাপার আর কি। জানা গেলো পূজোর দশমীর দিন হবে বড়দের নাটক আর একাদশীর দিন আমাদের অনুষ্ঠান, মানে যারা ডেঁপো হওয়ার বয়সে পৌঁছেছি, তবে বড়দের দলে জায়গা পাইনি এখনও তাদের। আমাদের দলের নেত্রী পচাদার বৌ খুকু বৌদি, যিনি নাচে, গানে, বলা কওয়ায় রীতিমত পাড়ার সেলিব্রিটি; মজার কথা হোল, পচাদা বড়দের দলের একজন হোতা, কিন্তু বৌদি আমাদের কচিদের দলেই রয়ে গেছেন, বুঝিবা কিছুটা নাম মাহাত্মেই।

খুকু বৌদির উৎসাহে নৃত্যনাট্য করা হবে ঠিক হোল, এবার কোন নৃত্যনাট্য হবে সেই নিয়ে চলল কদিন জোর চেঁচামেচি। কেউ বলে 'শ্যামা', তো কেউ বলে 'নটীর পূজা', শেষমেশ বিস্তর জল্পনা ও রীতিমত পলিটিক্স করে সবচেয়ে বেশী ভোটে জিতে গেলো খুকু বৌদি আর গাইয়ে গজাদার সিলেকশান 'চিত্রাঙ্গদা'। চিত্রাঙ্গদায় প্রধান চরিত্র তিনটি, কুরূপা নায়িকা (মানে পার্লারে মেক ওভারের আগে), আর সুরূপা, অর্থাৎ মেক ওভারের পরে। এছাড়া অবশ্যই অর্জুন; তবে আর এক জনও আছে, সে হোল মেক ওভার স্পেশালিস্ট মদনদেব। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে রেষারেষি পড়ে গেলো নাচিয়েদের মধ্যে; দুবেলা সবাই হত্যে দিচ্ছে খুকু বৌদির বাড়ি। বৌদিও সেয়ানা কম না, এই ফাঁকে, নিজের কচি মেয়েটাকে এককেজনের ঘাড়ে চাপিয়ে বেশ দুদিন সিনেমা দেখে এলো ঝাড়া হাত পা। তো যাই হোক, শেষমেশ নায়িকা বাছাই হোল, যদিও ঢের বেশী সুন্দরী হয়েও দীপা পেলো কুরূপার পার্ট আর চলনসই মিলি হোল সুরূপা। কানাঘুষো শুনেছিলাম, মিলির মা নাকি খুকু বৌদিকে বাচ্চার আয়া ঠিক করে দিয়েছেন। সমস্যা হোল অর্জুন নিয়ে, প্রথাগত ভাবে কোনও নাচ জানা মেয়েই কাজটা চালিয়ে নেওয়ার কথা, কিন্ত টুম্পা, (না সে মেয়ে নয়, রীতিমত জিমে যাওয়া ছেলে) ঝুলে পড়ল নায়ক হবে বলে। টুম্পা, টুকাইদার ভাই, তাকে খাতির না করলে চাঁদায় টান পড়ার আশঙ্কা, অতএব নাচ না জানা মুশকো অর্জুনই সই।

আমি চিরকালই গলাবাজেদের দলে, অর্থাৎ মুখে মুখে উপদেশ দিতে ওস্তাদ, কাজের বেলায় ঢেঁড়শ। খুকু বৌদির চিত্রাঙ্গদা পলিটিক্সে তাল দিয়েছিলাম (চিয়ার লিডার গোছের ব্যাপার আর কি), তাতেই বৌদি খুশি হয়ে আমায় সুরূপার গান গাইতে বলল। খেয়েছে, আমার গান মাহাত্য পাড়ার কুকুরগুলো আর বেপাড়ার ফচকে গেঁড়িগুলোর ভেংচিতেই প্রমাণ হয়েছে এর আগে; তাই ওই ঝামেলায় পা দিতে আর সাহস হোল না।

বললাম, 'আমাকে বরং নাচে একটা ছোটখাটো কিছু ...।'

'ছোটোখাটো? কি বলছ, তোমাকে কি সখীর দলে ভেড়ানো যায়?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খুকু বৌদির আর্তনাদ। বুঝলাম দূরদর্শী বৌদি বক্তিয়ার ক্যাডার হারাতে রাজী নন।

'দাঁড়াও এক কাজ করি, তুমি তাহলে মদনের পার্টটা কর' নিজেই বুদ্ধি বাতলালেন খুকু বৌদি।

অতএব, চিত্রাঙ্গদায় মদনা হয়ে সেদিনকার মত বাড়ী ফিরলাম।

যাইহোক, শুরু হোল জোরতালে রিহার্সাল, নাচতে গিয়ে পা আর হাত একসাথে চলেনা, যদিবা হাত পা নাড়ি কোনোরকমে, কোমর তো নড়েই না। ভরসা ছিল এই যে, অর্জুনের নৃত্যশৈলী আমার থেকেও দড়; রোমান্টিক সিনে তার নাচ যেন পালকি বেহাড়াদের কুচকাওয়াজ। এদিকে মদনের গান গাইবে বাপ্পাদা, সে একটা পেন কোম্পানীর সেলসে কাজ করে; রোদে ঘুরে ঘুরে তার গলা পুরোনো ট্রাঞ্জিস্টার, কখন বিগরোবে বলা দায়। এসবের মধ্যেই ফাংশানের দিন এগিয়ে এলো, দশমীর দিন সকালে হঠাৎ আমার চোখ লাল, জয়বাংলার শিকার হয়ে আমি মিয়োনো লুচি। যতই থেটার দলের মদনা হই, সেজেগুজে স্টেজে উঠে দেখিয়ে দেওয়ার সুপ্ত বাসনা আমারও ছিল।

খুকু বৌদি সাহস দিল, 'কুছ পরোয়া নেহি, শো মাস্ট গো অন; নাহয় চোখে মেকাপ হবেনা।'

যেমন কথা তেমন কাজ; খকু বৌদির নির্দেশমত ভাড়াটে মেক আপ ম্যান (রিটায়ার্ড এক যাত্রা আর্টিস্ট, পাড়ার এক কাকুর চেনা) মুখে সাদা ও ঠোটে লাল রং, আর মোটা কালো ভুরু এঁকেই ক্ষান্ত দিল; আমার চোখ চিরকালই ছোট, হাসতে গিয়ে বুজে যায়, তার ওপর সারা মুখে জবরদস্ত মেকাপের প্রকোপে হারিয়েই গেলো বলা যায়। কাকতাড়ুয়ার হাঁড়ির মত মুখ নিয়ে মোহনীয় কামদেবের ভূমিকায় আমার সে রূপ অনেকেই ভুলতে পারেননি বহুদিন।

এবার ফাংশানের কথায় আসি, দর্শকের আসন সেদিন ভরপুর, আমাদের পাড়ার প্রথম ফাংশান, তায় নায়কের ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতা, উত্তেজনা তুঙ্গে। প্রথম দিকটা ঠিকই চলছিল, দীপা ও সখীদের নাচ বেশ জমিয়ে দিয়েছে, অর্জুনকেও লোকে মেনে নিয়েছে, সে তখন তপস্বী, তাই নাচের দরকার পড়েনি; কিন্তু গোল বাধল যখন সুন্দরী দীপা প্রাত্যাখ্যাত হয়ে হাঁড়িমুখো মদনের কাছে সুন্দরী হবার বর চাইল। সিটি ও আওয়াজ দেওয়ার সেই শুরু, এরপর অর্জুনের কুচকাওয়াজ, মদনকণ্ঠী বাপ্পা দার ফাটা বাঁশের মত গলা, তার

ওপর আমার আলো করা রূপ, সব মিলিয়ে যাকে বলে ফুলটু এন্টারটেইনমেন্ট; দর্শকেরা সম্ভবত এটা চিত্রাঙ্গদার প্যারোডি মনে করে দারুন এনজয় করেছিল সেদিন। আমরা অবশ্য এরপর বহুদিন বেপাড়ার লোক দেখলে পালাতে পথ পাইনি; 'হা চিত্রাঙ্গদা!'

কুল না ফুল

শীতের দুপুরে মেয়েকে সাথে নিয়ে গেছি একজোড়া চটি কিনতে, তা অনেক দেখা দেখি করে একটা বেশ পছন্দ হল; কিন্তু আমার আধুনিকা কিশোরী মেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল 'লুক অ্যাট ইয়োর ফিট মাম্মা ইটস নট কুল!'

মেয়েকে গ্রাহ্য না করে জুতোটা কিনে বাইরে এসে মনে হোল কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়, ঠাণ্ডায় এবং অযত্নে আমার চরণ যুগল প্রায় কাকের ঠ্যাং এ পরিণত হয়েছে। কথাটা মাথায় ঘুরছিলো, হঠাৎ রাস্তার মোড়ে একটা ভারি চমকদার বিউটি পার্লার চোখে পরল। ভাবলাম বরং এখান থেকে খানিক পদমার্জনা করিয়ে পায়ের ভোল ফেরাই।

যেমন ভাবা, আমরা মা মেয়ে ঢুকলাম ভেতরে; ঢুকতেই কাউন্টারের মেয়েটি কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই আগে নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর লিখে নিল। প্রথম ধাক্কা সামলে নিজের প্রয়োজনের কথা জানালাম; যাই হোক আর একটি মেয়ে বেশ যত্ন করে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে পদসেবা শুরু করল। গরম জলের ছ্যাঁকা, নরুনের খোঁচা আর খামচাখামচির মাঝখানে হঠাৎ দেখি এক অতি সুসজ্জিতা মহিলা ভারি আন্তরিক ভাবে আলাপ করতে এলেন। মহিলার চাকচিক্যে আমি তো মোহিত, জানতে পারলাম ইনিই পার্লারের দিদিমণি, মানে মালকিন আর কি।

'তা ভাই আপনি ফেসিয়াল কোত্থেকে করান আপনার স্কিন কিন্তু খুব ভালো' ওঁর প্রশংসা বাক্য আমাকে শাড়ীর দোকানের কর্মচারীদের কথা মনে করিয়ে দিল, পৃথিবীতে একমাত্র ওরাই আমাকে 'ফরসা' বলে থাকে শাড়ী গছানোর জন্যে।

'করিনা তাই ভালো আছে' কথাটা কেমন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো, তবে মহিলা ওধার দিয়েও গেলেন না।

'সেকি ফেসিয়াল করেন না, তবে আজই শুরু করুন।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন স্কিন ভালো' আমার জবাব।

'আহা হা, এখন ভালো আছে, কিন্তু আচমকা একদিন সকালে উঠে দেখবেন চামড়া একেবারে কুঁচকে গেছে। আর ফেসিয়াল করলে বহুদিন আপনি একই রকম সুন্দরী থাকবেন', আবার শাড়ী দোকানের কথাটা

মনে হোল। যা হোক বুড়ো হতে আমার তেমন আপত্তি নেই; আর তাছাড়া আপত্তি করলেই কি আর বুড়ো হওয়া ঠেকানো যাবে? কিন্তু হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আয়নায় নিজের কোঁচকান মুখ দেখতে ভালো লাগবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

তাই জিজ্ঞসা করলাম 'তা আপনাদের কিরকম চার্জ টার্জ?'

'দেখুন ফেসিয়াল অনেক রকম, তবে আপনার জন্য গোল্ডটাই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'গোল্ড! মানে সোনা?' আমি তো হতচকিত।

'হ্যাঁ একেবারে ২৪ ক্যারাট।'

'নানা সেকি, সোনার তো আজকাল এমন দাম যে নাম মুখে আনতেও ভয় লাগে। গেলো বছর মামাতো ভায়ের বিয়েতেই সোনা দিতে পারিনি আর শেষে কিনা মুখে মেখে নষ্ট করবো!' আঁতকে উঠে বলি।

'তাহলে এক কাজ করুন আপনি বরং পার্ল ফেসিয়াল করুন, আপনাকে খুব সুট করবে।'

'পার্ল মানে আপনি মুক্তোর কথা বলছেন? সেটাও নিশ্চয়ই আসল?' আমার প্রশ্নে দিদিমণি মিষ্টি করে হেসে সায় দিলেন।

'দেখুন, এক আধ ছড়া মুক্তোর হার আমার আছে বটে কিন্তু সেতো সবই কালচার্ড। আসল মুক্ত তো কেবল মিউজিয়ামেই দেখেছি। এতটা বাড়াবাড়ি করা বোধহয় ঠিক হবে না।'

'বেশ তবে বরং আপনি ফ্রুট ফেসিয়াল করুন, সেই বা মন্দ কি!' মহিলাকে যত দেখছি ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমার বেড়ে উঠতে লাগলো।

'তা ফ্রুট ফেসিয়ালের ব্যাপার টা কি?' আমি বেশ কৌতুহল বোধ করলাম।

ছেলে ভোলানো মায়ের স্নেহে দিদিমণি বোঝাতে লাগলেন, 'দেখুন আঙুর, পেঁপে, বেদানা, এই যে সব ভালো ভালো ফল এই দিয়েই আমাদের ফ্রুট ফেসিয়াল; স্কিনের পক্ষে ভারি ভালো।'

'সেকি ফলের যা দাম, তা এগুলো মুখে মেখে নষ্ট না করে খেলে ভালো হয় না?'

এতক্ষণে দিদিমণির মাখন গালে একটু বিরক্তির ভাঁজ পরলো, 'তা আপনার যা বাজেট মনে হচ্ছে তাতে আপনি হারবাল ফেসিয়াল করুন।'

'সেটা কি রকম?' আমি এখনো কৌতুহলি।

'এ হল গিয়ে শাক সবজি লতা পাতার ব্যাপার।'

'যাক তাহলে এটাই আমার পক্ষে ভালো। আজই বাড়ী গিয়ে রান্নাঘরের জিনিস টিনিস দিয়ে ব্যাপারটা সেরে ফেলব এখন' এতক্ষণে আমি স্বস্তির নিঃশাস ফেলি। তাড়াতাড়ি পদসেবার বিল মিটিয়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দিদিমণিও আঁধার মুখে আমাকে বেড়াল পার করে বাঁচলেন।

মেয়ের মুখ দেখে অনুমান করলাম সে একটুও খুশী নয় আমার ব্যাবহারে। বুঝলাম, ফুল (অর্থাৎ বোকা) হতে চাইনি বলে কুল (অর্থাৎ আধুনিক) হওয়া আমার হলনা!

রাগে অনুরাগে
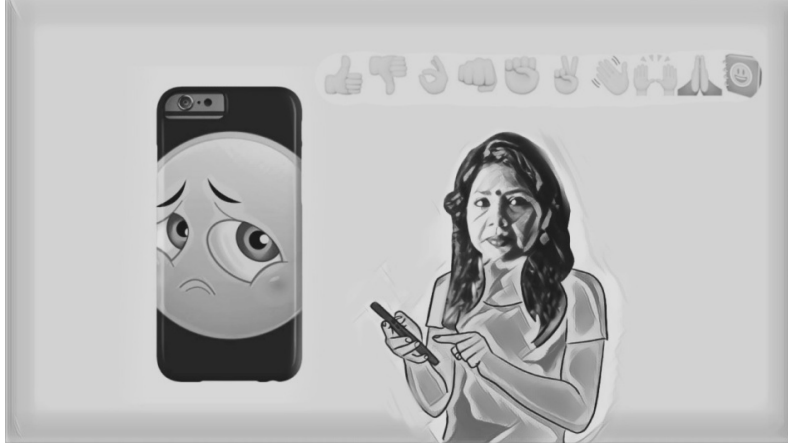
রাগ করেছ?' মোবাইলে মেসেজটা দেখে ভাবতে বসলাম কাকে কাকে দুএকদিনের মধ্যে দাঁত খিঁচিয়েছি। 'জবাব দিচ্ছ না যে, এতো রাগ!'

'আচ্ছা আমি নাহয় মাফ চাইছি হল তো?' এযে মেঘ না চাইতেই জল! শেষ কবে কেউ এমন মিষ্টি করে আমার রাগ ভাঙিয়েছে মনেই পরে না (বাড়িতে বাকিদের মানভঞ্জনের মনপলি আমারই কিনা)।

ভাবছি জবাবে কি লিখি, এরমধ্যেই আরেকটা মেসেজ, 'নীপা প্লিজ কিছু বল।' যাক এতক্ষণে সব ফরসা হল, মেসেজগুলো নীপা নাম্নী এক সৌভাগ্যবতীর; মানে যার রাগ অন্ততঃ একজনের কাছেও ভারি দামী।

বেচারি প্রেমিকের জন্যে প্রাণটা কেমন হুহু করে উঠল, জবাবে লিখলাম, 'আমি তো নীপা নই, আপনার বোধহয় কিছু ভুল হয়েছে।'

'ভুল তো হয়েছেই, আর সেতো আমি স্বীকার করছি, তা বলে আমাকে এড়াতে বলে দিলে তুমি নীপা নও!'

'না না বিশ্বাস করুন আমি সত্যি নীপা নই, নীপা নামের কাউকে চিনিও না।'

'নীপা তুমি যদি বারবার এরকম বল আমি কিন্তু ঠিক একটা কিছু করে বসবো!' আমি আতঁকে উঠি, শেষে কি আত্মহত্যার প্ররোচনায় জেলে যাবো!

মেসেজের অভিমানী হুমকি সমানে চলছে; অনেক ভেবে মেসেজ করলাম, 'বেশ তবে আমাদের বাড়িতে এসে যা বলার বল, আমি শুনব।' ভাবলাম, মোবাইল নম্বর ভুল হয়েছে বলে বাড়ির নম্বর তো আর ভুল হবে না, ফলে সমস্যা মিটবে।

'নীপা সত্যি বাড়িতে ডাকছ? কোন গোলমাল হবে না তো?'

'না না গোলমাল কিসের, তুমি বাড়ির সামনে এসে একটু দাঁড়াও, ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে' আমি স্বান্তনা দিই।

'বেশ তবে আসছি, ঠিক দশ মিনিটে বারান্দায় এসো আমায় দেখতে পাবে।'

খানিক পরে আবার মেসেজের গুঁতো, 'কি হল, বারান্দায় এসো, দেখ তোমার পছন্দের লাল টিশার্টটা পরেছি।'

এবার আর জবাব দিলাম না। সবে বিকেলের চা টা নিয়ে বসেছি, বাইরে থেকে ক্রিকেট বল এসে পরল বসার ঘরে; আজকাল এই এক জ্বালাতন পাড়ার হবু শচীনদের নিয়ে। রাগ করে বলটা বাইরে ফেলতে বারান্দায় গিয়ে আমি থ; লাল টিশার্ট পরা এক রোমিও জুলুজুলু চোখে চেয়ে আছে আমাদের বিল্ডিঙের দিকে। তেল সাবান না জোটা লম্বা চুল, গালে খোঁচা দাড়ি বছর পঁচিশের এক ছোকরা; আগে কোনদিন দেখেছি বলে মনে পরে না। কি বিপদ, শেষে মেসেজগুলো কি আমাকেই করেছিল নাকি? আমার সন্দীপা নামটাকেই ছোটো করে নীপা; মাথা একেবারে ঝিম ঝিম, ভেতরে এসে সোফায় বসলাম কোনমতে। প্রেম অন্ধ একথা অনস্বীকার্য, তাবোলে দেড়া বয়সের এক খিটকেল মহিলা! ছোকরার পছন্দের মাথামুণ্ডু পেলামনা, এদিকে চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। এরমধ্যে বেলটা বেজে উঠল, কি জানি ছোঁড়ার এতো সাহস শেষে ফ্ল্যাটে হানা! ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখি বীথি, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বীথি আমাদের নীচের ফ্ল্যাটে থাকে, মাস কমুনিকেসনে মাস্টার্স করছে, ভারি মিষ্টি মেয়ে; বৌদি বলে ডাকে, মাঝে মাঝে গল্প করতে আসে আমার সাথে।

সকালে ওআমার একটা শাড়ী নিয়েছিল, কলেজের কোন অনুষ্ঠানে পরবে বলে, বুঝলাম ফেরত দিতে এসেছে, 'এতো তাড়া কিছু ছিলনা বীথি' আমি ভদ্রতা করি।

'তাড়া ছিল বইকি বৌদি, দাদার ফোনটা আসায় দৌড়ে এলাম ফেরত দিতে।' মাথাটা গুলিয়ে গেলো, ওকে ভেতরে আসতে বলে বসে পরলাম।

'দাদা ফোন করে শাড়ী ফেরত দিতে বলল?'

'ধ্যাৎ, কি যে বল; শাড়ী নয় এটা ফেরত দিতে এসেছি' ও নিজের মোবাইলটা এগিয়ে দিলো।

'মানে?' আমি হতচকিত।

'আরে সকালে গল্পের চোটে ভুলে তোমারটা নিয়ে গেছিলাম, এখন দাদার ফোনটা পেয়ে বুঝতে পারলাম।' আমাদের দুজনের মোবাইলের মডেল এক, অতঃপর... এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

'আমারও তোমাকে কিছু ফেরত দেবার আছে নীপবীথি।'

'কি?'

'সেটা বারান্দায় গিয়ে দেখ নীপা' আমি হেসে বলি।

আজব অভিজ্ঞতা

মাঝারি সাইজের ঘরটার একপাশে কাউন্টার, সেখানে গম্ভীর মুখে বসে বছর পঁচিশেকের একটি মেয়ে, কাউন্টারের সামনে থেকে লাইন শুরু হয়ে দরজার বাইরে সিঁড়িতে এসে ঠেকেছে।

বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে খানিকটা বিভ্রান্ত স্বরে সামনে দাঁড়ানো মহিলাকে জিজ্ঞেস করি, 'এখানে প্রিন্সেস স্টুডিয়োটা কোথায়?'

আমাকে খানিকটা জরীপ করে মহিলা জবাব দিলেন, 'এটাই।'

'তাহলে এই লাইন?'

'প্রথমবার? ও...। এটা কুপনের লাইন, কুপন নিয়ে ভেতরে বসতে হবে, ওরা নম্বর অনুযায়ী ডাকবে।'

আমি তখনও খানিকটা ধোঁয়াশায়, তবু বাঙালী তো, লাইন দেখলেই রিফ্লেক্স অ্যাকশনে দাঁড়িয়ে পড়ার অভ্যেস; তাই এখনও কথা না বাড়িয়ে মহিলার পেছনে হাতের ব্যাগ সামলে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'কয় জোড়া?'

কাউন্টারের কন্যের যান্ত্রিক প্রশ্নে কোনক্রমে তুতলে উত্তর দিলাম, 'একটাই।'

তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে আমাকে একবার দেখে নিয়ে একটা কুপন বাড়িয়ে দিলো সে, 'ওদিকের বেঞ্চে বসুন, সময় লাগবে' সাথে নির্লিপ্ত নির্দেশ। দেওয়াল লাগোয়া সারি দেওয়া লম্বা বেঞ্চিতে বসে আছেন জনা পনেরো মহিলা, সকলের হাতেই বড়সড় ব্যাগ ও চোখেমুখে নির্বেদ সহিষ্ণুতা; বুঝলাম এখানে সুবিধে পেতে সময়ের হিসেব ছাড়তে হবে। যাইহোক, গুছিয়ে বসতে বসতে খেয়াল করলাম বেঞ্চির অপরপারে রয়েছে প্লাইউডের ছোট্ট ঘেরাটোপ, সেটাই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

ঘেরাটোপের দিকে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষায় আছি, ভেতর থেকে জাঁদরেল মহিলা কণ্ঠের নির্দেশাবলী ভেসে এলো, 'বড় করে নিঃশ্বাস নিন, হ্যাঁ, এবার হাতদুটো তুলুন... আহাহা, অতটা নয়। সোজা হয়ে দাঁড়ান, নড়ছেন কেন? গলাটা... গলাটা কি আপনার এরকম ফোলাই থাকে বরাবর না ঠান্ডা লাগিয়েছেন?' প্রায় মিনিট দশেক কোস্তাকুস্তির পর বেরিয়ে এলেন এক আন্টি, চেহারা বিধ্বস্ত, মুখে বিজয়িনীর হাসি।

পরের জন কলেজ পড়ুয়া তন্বি, ভেতরে যেতেই শুরু হোল আর এক প্রস্থ হুকুমনামা, 'তুমি আগের থেকে একটু শুকিয়েছো মনে হচ্ছে? পড়াশোনার চাপ না ডায়েটিং?'

‘কই আর শুকালাম, আমার তো মনে হয় মোটাই হয়েছি’ তন্বির ন্যাকা ন্যাকা স্বর চাপা পরে গেলো জাঁদরেল কণ্ঠের দাবড়ানিতে।

‘রোগা মোটা কোনোটাই হওয়া চলবেনা! নিজেরা ইচ্ছেমত বাড়বে কমবে, তারপর হ্যাপা সামলাবো আমি?’ ঝাড় খেয়ে মুখ শুকিয়ে বেরিয়ে এলো মেয়েটি বেশ খানিক্ষণ পরে।

পরের জন এক মেজাজী বৌদি, মুখচোখ দেখে মনে হয় বাড়িতে কাজের মাসি ডুব মেরেছে কদিন। ‘গতবারের মত ভোগাবেন না এবার’ ঢুকেই তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন।

‘কি বললেন? আমি ভোগাই!! আপনি নিজের ইচ্ছে মত ফুলবেন, শুকোবেন, বেছে বেছে পয়লা বৈশাখ আর পূজোর আগে হাজির হবেন, আর বলছেন আমি ভোগাই!’ এরপর জলতরঙ্গের মত চলল বাক্যস্রোত, মুখরা বৌদি একেবারে স্পকটি নট; খানিক পরে যখন বেরোলেন একেবারে বর্ষাকালের মিয়ানো মুড়ি।

এভাবেই ঘেরাটোপের নেপথ্য আলাপ শুনতে শুনতে কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ চমক ভাঙল গম্ভীর হুংকারে, ‘কি ব্যাপার নেমন্তন্ন করে ভেতরে আনতে হবে না কি?’ বুঝলাম, আমার আগের মহিলা বেরিয়ে গেছেন, এবার আমার পালা, অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করিনি।

‘এই প্রথম?’ প্রশ্নকর্ত্রীর গলার আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে চেহারাও সমান রাশভারী, অনেকটা টিভি সিরিয়ালের শাশুড়ি গোছের।

‘হুম... দেখেই বুঝেছি, এমন বেখাপ্পা ফিটিং আমার এখানে হয় না’ আমাকে ভালো করে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন মহিলা; ঠিক সিরিয়ালের গরীব আত্মীয়ের সাথে যেভাবে কথা বলা হয় সেভাবেই।

‘তা কি রকম চাই?’

‘আপনার যা ঠিক মনে হয়, সেরকম হলেই চলবে’ আমি বিনয়ে বিগলিত।

‘হ্যাঁ, আমার মত নিলে, আমি চেহারা বুঝে বানিয়ে দেব; যারা নিজে ওস্তাদি করতে যায়, তারাই পরে ভোগে।’ মনে হোল আমার কথায় তিনি বেশ খুশী হয়েছেন। এরপর চলল নানান ভাবে মাপ নেওয়া, আর এক গোছা ম্যাগাজিনের পাতা ঘাঁটা; এসবের মধ্যে আমার ভূমিকা সামান্যই, শুধু কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর নির্দেশ মত হাত পা নাড়া। প্রায় মিনিট কুড়ি এভাবে চলার পর টেবিলে রাখা কাগজে কয়েকটা ডিজাইন আঁকা হোল, এতক্ষণে দিদিমণির মুখে হাসি।

‘এগুলো একেবারে অন্যরকম, দেখবেন কেমন মানিয়েছে। এবার কাপড় গুলো চটপট বের করুন, দেখে নিই ঠিক আছে কিনা।’

‘আজ্ঞে, কাপড় গুলো তো নয়, একটাই সুতীর পিস্’ আমি মিনমিন করি।

‘কি!!’ একটা ভয়ঙ্কর গর্জনের সাথে মনে হোল পারটিশানটা নড়ে উঠলো।

সেদিন কিভাবে ‘প্রিন্সেস স্টুডিয়ো’ নামের অতি আধুনিক দর্জির দোকান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরেছিলাম, ভাবলে এখনও হাত পা কাঁপে।

লুটেরা বাতাস

মেয়ের বিদেশী স্কুলে কমিউনিটি সার্ভিস তথা নানা সমাজসেবামূলক কাজকর্ম হয়ে থাকে, সেসব কাজের জন্য অর্থের যোগাড়ও হয়ে থাকে বিভিন্ন উপায়ে; যথা নানান অনুষ্ঠান (ডান্স পার্টি, থিয়েটার ইত্যাদি), সর্বোপরি 'সেল' এ জামাকাপড় বিক্রি থেকে। এই 'সেল' ব্যাপারটা ভারি জনপ্রিয় এবং প্রতিবারই নির্ধারিত দিনে অভিভাবকেরা যেরকম মরিয়া হয়ে সমাজসেবায় ছুটে আসেন, তা সত্যিই হৃদয়স্পর্শী।

আমরা তখন ঢাকায় সদ্য এসেছি, স্কুলে নতুন; খবর পেলাম এরকম একটি সেলের। মেয়ের সহপাঠিনীর মা, ভারী উপকারী, নিজে থেকেই উৎসাহ দিলেন, 'দুশো টাকা রেটে ঢালাও প্যান্ট, জামা, ড্রেস, এমনকি গরম জামা পর্যন্ত; সব ভালো ভালো ব্রান্ডের' আমাকে এর বেশী বলার প্রয়োজন হোলনা, সমাজসেবার মহৎ উদ্দেশ্যে ততক্ষণে আমি অদম্য।

যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে সময়ের বেশ কিছু আগেই বেরিয়ে পড়লাম নিমরাজি মেয়েকে বগল দাবা করে; ওকে সঙ্গে নেবার মুল উদ্দেশ্য ভীড়ের মাঝে বোঁচকা সামলানো, মুখে অবশ্য বললাম, 'নিজে পছন্দ করে নিতে পারবে, ভালো হবে না?' পৌঁছে দেখি হলের বন্ধ দরজার সামনে কাতারে কাতারে জন সমাবেশ; আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, জাতির বৈচিত্রে মিল শুধু একটাই, হাতে সকলেরই বড় বড় ঝোলা। বুঝলাম, এ বড় শক্ত ঠাঁই; 'চোখ, কান খোলা রেখো' মেয়েকে সতর্ক করে রেসের ঘোড়ার মত তেরিয়ে রইলাম দরজা খোলার অপেক্ষায়। এভাবে কাটল বেশ খানিক্ষণ, স্বাভাবিক নিয়মেই একটু আলগা হয়েছে আমার তৎপরতা; অমনি আচমকা খুলে গেল গুপ্তধনের গুহা। কিছু বোঝার আগেই প্রায় ভাসতে ভাসতে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, ভাগ্যিস মেয়ের হাতটা ধরা ছিল তাই নিরুদ্দেশ ঘোষণার প্রয়োজন হল না।

তবে মুশকিল অন্য দিকে, ঢুকে তো পড়লাম, কিন্তু থামা দায়। এ টেবিল, ও টেবিল পেরিয়ে স্রোতে ভাসতে ভাসতে উপায় না দেখে শেষে একখানা টেবিল ক্লথ প্রানপনে খামচে ধরলাম। যাক, এবার থামা গেছে ভেবে সুস্থির হবার আগেই, 'এক্সকিউস মি' তীক্ষ্ণ হুংকারে চমকে দেখি, টেবিল ক্লথ নয়, আমি এক শ্বেতাঙ্গিনীর সাদা ফ্রকের কোণা চেপে ধরে আছি। কোনমতে ক্ষমা চেয়ে তেড়ে গেলাম সামনের টেবিলে ডাঁই করে রাখা টিশার্টের দিকে। একটা বেগুনী টপ চোখে লাগল, হাত বাড়াতেই একটা থাবা নাকের ওপর দিয়ে সেটা উড়িয়ে নিয়ে গেলো; এরপরে লাল, সবুজ, কমলা তাক করেও কোনটাই কব্জা করতে পারছি না।

একটা লেসের কলার ওয়ালা নীলচে টিশার্ট নজরে আসতেই প্রানপনে চেপে ধরলাম, টানবার আগেই এক ছ-ফুটিয়া লালমুখো তার আর এক দিক চেপে ধরল। সেও ছাড়বে না, আমিও হয় এসপার নয় ওসপার; খানিক চলল এই টাগ অফ ওয়ার, শেষে আমার গোঁ দেখে সাহেব রণেভঙ্গ দিলো, জয়ের উল্লাসে আত্মহারা আমি খেয়াল করলাম না টানাটানিতে সাধের কলার ভীতু কুকুরের কানের মত ছেতরে গেছে। এভাবে যুদ্ধনীতি খানিক রপ্ত হতে ঠিক করলাম বাছাবাছি পরে, আগে যা পাই ওঠাতে হবে; এ ব্যাপারে দেখলাম মেয়ে আমার থেকে চৌকশ, মিনিট দশেকের মধ্যেই খান কুড়ি জামা কাপড় বাগিয়ে ফেলল। যা হোক বাছাবাছির সুযোগ নেই, তাই মোটামুটি আন্দাজে সাইজ দেখে নিয়ে কাপড়ের বান্ডিল জড়ো করে এগোলাম কাউন্টারের দিকে। ভল্যান্টিয়ার হিসেব কষছেন, তাতেও শান্তি নেই; এক ক্ষীণতটি পীতাঙ্গীনি (সম্ভবতঃ টেবিলে টেবিলে বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে) ফিরতি পথে আমার সংগ্রহে হাত বাড়িয়েছেন। 'এক্সকিউস মি' এবারে আমি হুংকার দিলাম অনেকটা 'সিংহাম' স্টাইলে।

ব্যাগ বোঝাই ও পকেট হালকা করে বাড়ি ফিরে সদর্পে পসরা খুলে বসলাম; উদ্দেশ্য আমার বিচারবুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন বাড়ির কর্তাটিকে তাক লাগিয়ে দেওয়া। প্রথমেই দুটো টপ বেরোল, একটা মেয়ের বছর দুয়েক আগেকার সাইজ, অন্যটাতে মা মেয়ে দুজনে একসাথে ঢুকে যাওয়া যাবে। এ ভাবে কোনটার বিটকেল আকৃতি, কোনটার বা উৎকট রঙ মোটের ওপর আমার মত অতি উৎসাহীর ও কাছাখোলা অবস্থা।

'হরির লুটের বাতাসা, মন্দ কি!' কথাটা হাওয়ায় উড়িয়ে আমার স্বল্পভাসী পতিদেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন; যেতে যেতে যে খিঁকখিঁকে হাসিটা উপহার দিয়ে গেলেন, মনে হোল একশটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে একসাথে কামড়ে দিলো।

বাহারে সমুদ্র বিহার

মেয়ের বিদেশী স্কুলে ক্রিস্টমাসের লম্বা ছুটি, বিদেশী বন্ধুরাও সব স্বদেশমুখী; অতএব ঢাকায় তার মন চঞ্চল।

বললাম 'আমরাও তো কলকাতা যাবো, ছুটি বেশ কাটবে।'

মেয়ে তার ওঁচানো নাক আরও উঁচিয়ে বলল 'সেটা আবার বেড়ানো হল? বন্ধুরা সব গেছে কোরিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা - আর আমি আধ ঘণ্টার রাস্তা কলকাতা?'

কি বিপদ, তা বাঙালি হয়ে যখন জন্মেছ, হোম ভিসিট তো গুয়াটেমালা কিম্বা হনলুলুতে হবে না; তা সে কথা কে বোঝে! শেষমেশ বাবারূপী স্যান্টা উদ্ধারে নামলেন, ব্যাবস্থা হোল সিঙ্গাপুর থেকে স্টার ক্রুসে সমুদ্রবিহারের।

যাবার দিন, মাত্র ছঘন্টা লেট বিমান-বাংলাদেশে 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' আবহ সঙ্গীত এবং বিকেল সাড়ে চারটেয় মাংস-ভাত ও পায়েসের মেনু দেখে যুগপৎ পুলকিত ও শিহরিত হলাম (অবশ্য ফেরার সময় সন্ধ্যে ছটাতেও মৌলিকত্ব বজায় রেখে বিরিয়ানি দেওয়া হয়েছিল এবং লোকে ভারি তৃপ্তি সহকারে তা খেয়েছিল)।

পরদিন সকালে হার্বারফ্রন্ট জাহাজঘাটায় পৌঁছে মনে হোল যেকোনো আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট টার্মিনালকে লজ্জা দেবে। আমরা একটু আগেভাগেই পৌঁছে ছিলাম, যাতে হুড়োহুড়ি না করতে হয়; পৌঁছে দেখলাম জনসমুদ্রের ঢল, কারন প্রায় ষাট শতাংশ যাত্রীই আমার মত ব্যাস্তবাগিশ ভারতীয়। যাত্রীরা ভারতীয় হলেও, কর্মকর্তারা কর্মঠ সিঙ্গাপুরি, তাই নিয়মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে জাহাজে চড়তে বিশেষ বেগ পেতে হল না। এতদিন ওসান লাইনার বইয়ে পড়েছি, আর টাইটানিক সিনেমাতে দেখেছি, এক আধবার সমুদ্র বক্ষে দূর থেকেও দেখেছি; এবার ভেতরে গিয়ে সত্যি চমক লাগার পালা, এতই সুন্দর আর বিলাসবহূল ব্যাবস্থা। প্রাইভেট ডেক অর্থাৎ ব্যালকনি সহ আমাদের কেবিনটা যেন সাজানো একটা পুতুল ঘর, আর তার সাথের স্নানঘর আরও মজার, ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে সবরকম সুবিধে কেমন কায়দা করে আঁটান হয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

বারোতলা জাহাজের বিভিন্ন তলায় চেয়ার পাতা মনোরম ডেক, অসংখ্য সুইমিং পুল, রেস্তরাঁ, ক্যাসিনো এবং চমকপ্রদ সব বিনোদনের বন্দোবস্ত। যাইহোক, জাহাজ পরিদর্শন শেষে ভরপেট চৈনিক আহার সেরে

এগার তলার ডেক এ চেয়ারে লম্বা হলাম; ফুরফুরে হাওয়া, সামনে আ-দিগন্ত সমুদ্র, আর একটু দূরে ছোটো পুলে কয়েকটা চীনে বাচ্চার হুটোপুটি - দেখতে দেখতে কখন চোখ লেগে এসেছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ একটা বাঁশফাটা চিৎকারে কলজে লাফিয়ে উঠল, আর তার সাথেই শুনতে পেলাম ঢাকের গুরু গর্জন। ব্যাপারটা ভালো করে ঠাহর করতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, তখনি চোখে পরল পুলের সামনে একটা ছোটো খাটো জটলা; আর সেই জটলার মধ্যমণি এক চীনে মহিলা এবং তাঁর এক দেশোয়ালি ষণ্ডা জোয়ান। নিঃসন্দেহে, শব্দ তরঙ্গের যুগলবন্দী এঁদেরই অবদান; তবে ব্যাপারটা বেশীক্ষণ শুধু শব্দযুদ্ধেই থেমে রইলো না, অচিরেই পুরুষটি গলাবাজিতে পিছু হটে ঘুসি পাকাতে শুরু করল, লক্ষ অবশ্যই চিনে বীরাঙ্গনা। মহিলা তাতে দমবার নন, তাঁর কর্ণভেদী তারানা আমাদের সাথে সাথে প্রতিপক্ষ পুরুষটিকেও পর্যুদস্ত করে দিচ্ছিল। বুঝলাম জেন্ডার ইকুয়ালিটিতে চীনেরা আমাদের থেকে ঢের এগিয়ে। এবারে কৌতূহল দমন করতে না পেরে একটু খোঁজ করে মালুম হোল এঁরা পুলের খেলুড়ে দুটো বাচ্চার যথাক্রমে মা ও বাবা। বাচ্চা দুটি খেলতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু নিয়ে ঝগড়া শুরু করে এবং মৌখিক ঝগড়ায় সুবিধে করতে না পেরে মহিলার ছেলে তার ফ্লোটারটা অন্যজনের মাথায় ভাঙে, তারই ফলে এই কুরুক্ষেত্র। যাহোক, খানিক বাদে জাহাজকর্মীদের হস্তক্ষেপে মিটমাট হোল, মহিলা অপরপক্ষের শাসানি উপেক্ষা করে ভাঙা ফ্লোটার হাতে দুর্ধর্ষ ছেলেকে নিয়ে ডেক দাপিয়ে চলে গেলেন, পিছু পিছু যাওয়া নিরীহ জীবটিকে দেখে বুঝলাম মহিলার স্বামী যাকে এতক্ষন চোখে পরেনি। বাঙালি স্বামীদেরই শুধু স্ত্রৈণ অপবাদ দেওয়া নিতান্ত অন্যায় সন্দেহ রইলো না।

ভারতীয় যাত্রীরা প্রধানত দুধরনের, একাংশ অবশ্যই মধুচন্দ্রিমা যাপনে ক্রুজে, তাদের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারতের আধিক্য; আর একটা বড় অংশ গুজরাতি, যারা বাবা-মা, ছেলে-বউ, নাতিনাতনি সহ পরিবারকেন্দ্রিক ভ্রমনে এসেছেন। এক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে লক্ষ করার মত, তা হল বয়স, চেহারা ও আয়তন নির্বিশেষে খাটো পশ্চিমি পোশাকের চূড়ান্ত সমারোহ। এব্যাপারে, তন্বী নববধূ এবং মেদবতী আন্টি সব একাকার এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একের সাথে অন্যের পোশাকের ভীষণ মিল, যা দেখে অনেকবার একথাও মনে হচ্ছিলো যে পোশাকগুলো সম্ভবতঃ একই দোকানের। তা ডেক এ বসে মহিলাদের খাটো পোশাকের র‍্যাম্প ওয়াক দেখতে মন্দ লাগছিল না, যদিও তার মাঝে দু একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। সে প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা কথা বলে রাখি, ভারতীয় যাত্রীরা ডেক এ বসে সময় নষ্ট না করে সকাল থেকে রাত সুইমিং পুল, জাকুসি এবং ফ্রী রেস্তোরাঁতেই ভীড় করতেন। এবার আসা যাক দুর্ঘটনার কথায়। মাঝ সমুদ্রে প্রাক-সন্ধ্যায়, বারোতলার ডেক এ দুরন্ত হাওয়া, আমি যথারীতি ডেক চেয়ারে আধশোয়া; একটু দূরে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নানান ভঙ্গীমায় ছবি তুলছে এক নবদম্পতি। আমার মত, কিছু দূরে খোলা রেস্তরাঁয় বসা এক মধ্যবয়সী দম্পতিও ওদের লক্ষ করছিলেন; কিছু পরে দেখি ভাবিজি উঠে গিয়ে দাড়ালেন রেলিং ধরে, ক্যামেরা তাক হতেই এক অভাবনীয় মূহূর্ত্ত – ভাবীর ফ্রক উড়ে একেবারে মরিলিন মুনরো, তফাতটা শুধু আয়তনে। জাহাজের প্রতিটি ডেক এর চার কোনায় একটা করে জাকুসি সকাল থেকে রাত চালু থাকতো এবং যথারীতি এর প্রত্যেকটিই বেশিরভাগ সময় থাকতো ভারতীয়দের কবলে। দুপুর নাগাদ সেরকম একটি জাকুসি থেকে এক প্রায় বৃদ্ধা দশাসই আন্টি বেরিয়ে এলেন, উদ্দেশ্য ডেক এর অন্য প্রান্তে চেঞ্জিং রুমে যাওয়া। সুইমিং কস্টিউমে অনভ্যস্ত আন্টি দুটি তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে চলেছেন ব্যাস্ত পায়ে, মাঝ বরাবর পৌঁছে হঠাৎ নিম্নাঙ্গের তোয়ালেটি গেল খুলে; এর পরের দৃশ্য বর্ণনা করার দুঃসাহস আমার নেই।

এবার আসি জাহাজের বিভিন্ন বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের কথায় (আমার অবশ্য ডেক এ বসেও বিনোদনের অভাব হয় নি)। আন্তর্জাতিক জাহাজের বিনোদনও সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক ও পক্ষপাত বর্জিত, সেখানে কোরিয়ান কমেডি, ব্রাজিলিয়ান নাচ থেকে বলিউড নাইট কিছুই বাদ যায় নি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল জাহাজের ক্রু মেম্বারদের একটি অনুষ্ঠান, সেখানে হিন্দি গান, ব্যালে নাচ, হিপ হপ এমনকি জাগলারি

শো দেখে এরা যে পেশাদার নয় ভাবতে অসুবিধা হচ্ছিলো। চারটি চিনে মেয়ে ভারি সুন্দর একটি চিনে গান গাইতে গাইতে স্টেজে এলো, সুরটা কেমন চেনা চেনা; আমার মেয়ে খুব কোরিয়ান গান শোনে তাই ওকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওটা অতিপরিচিত হিন্দি গান 'ছাঁইয়া ছাঁইয়া', চিনে উচ্চারণের গুণে যা অমন আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষ আইটেম ছিল তিন 'ডিভা'র ইঙ্গিতপূর্ন ফ্যাশন ওয়াক, আমাদের আইটেম গার্লরা যার কাছে নেহাতই জোলো। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে রেস্তোরাঁর একটি ওয়েট্রেসের কাছে অনুষ্ঠানের প্রশংসা করায় সে একটি ওয়েটার ছেলেকে এনে হাজির করল, 'তুমি কিসে ছিলে?' জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি লাজুক হেসে জানালো সে ওই তিন সুন্দরীর একজন। বলাই বাহুল্য এরপর আমি বাকশক্তি রহিত।

সফর শেষে জাহাজ থেকে নামার সময় যেন একটা মনকেমন করা অনুভূতি এই বিশাল ক্রুজের কোন ও এক কোনায় ফেলে এলাম, আর তার বদলে সঙ্গে নিয়ে এলাম একরাশ বিস্ময়, ভাললাগা আর কিছু অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

একটি গোয়েন্দা ছবি ও পাঁচ ভূত

গত সোমবার, সাত বন্ধুর আড্ডার হিড়িকে কথা উঠলো একসাথে সিনেমা দেখার; থাকি তেপান্তরে, কোলকাতায় এলে সিনেমা না দেখলে প্রাণ আইঢাই, তাই সবার আগে লাফিয়ে উঠলাম আমিই। পিয়ালী আর শর্বরীও রাজী, দুপুরে সংসারে ফাঁকি মেরে পালিয়ে আসবে, মিতুসী থাকে বন হুগলী, তায় ছেলে আসবে দুদিন পরেই, দেখলাম ফাঁকি মারতে ওর আগ্রহ তুঙ্গে। সুমনা হাই সুগারে কাতরাচ্ছে, সেই কোঠারীতে যাবে ডাক্তার দেখাতে; শরীর যাক চুলোয়, সিনেমা দেখতে জীবন পণ রাখতে রাজী, শেষে কিনা কষ্টে নিরস্ত করা গেলো ওকে। এদিকে দীপার অফিস, বেটা প্রথমে খানিক দায়সারা কাঁইকুঁই করছিল, শেষে আমাদের গুঁতোয় হাফ সি-এল নেবে বলে হুঙ্কার ছাড়লো ('যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দেবো বেণীর সঙ্গে মাথা' স্টাইলে)। ঠিক হল সব জুটবো বাড়ীর কাছের মলে ১.৩০টা নাগাদ।

দীপার হাফ ডে নিলে ১২ টায় ছুটি হয়, তাই বুদ্ধি দিলাম 'দেরী না করে চল তুই আমি ১টায় পোঁছই, হকের ছুটি পুরোটা উশুল না করলে চলে!' সেই মত আমরা দুজনায় ফুডকোর্টে যতক্ষণে পৌঁছেছি, প্রায় সওয়া একটা বাজে, দীপা অফিস থেকে এসেছে তাই খেতে হবে।

বললাম 'হাতে সময় কম, তুই ধোসা খা।'

তা না, দীপা দৌড়ল নান কিনতে, নান তো আর শুধু খাওয়া যায় না, তাই সাথে পনিরের সবজি। আমরা তীর্থের কাক হয়ে দোকানের কাউন্টারে এঁটে আছি, তাড়াতে না পেরে তাড়াতাড়ি খাবারটাই দিলো দোকানদার শেষে। এবার খাবারের পরিমাণ দেখে দীপার অবস্থা খারাপ, পনির এক গামলা, আর নানটা একটা ছোটখাটো গামছা।

'আমি একা এতো কি করে খাব, তুইও খা', দীপার কাকুতি'।

বিপদ বুঝে, 'সময় হয়ে গেছে, আমি ওপরে গিয়ে দেখি' বলে কেটে পড়লাম আমি (ম্যাও সামলাক ও)।

ওপরে শর্বরী এসে গেছে ততক্ষণে, একটু পরে এসে গেল পিয়ালীও, দীপার তখনও দেখা নেই। মিতুসীর ফোন এলো এরমধ্যে, আমি কানে চিরকালই খাটো, ভালো বুঝলাম না কি বলছে, তবে আন্দাজ করলাম মলে ঢুকছে। কি সিনেমা দেখা যায়? দেখা গেলো সময় অনুযায়ী খালি একটা নতুন বাংলা গোয়েন্দা সিনেমা

সুবিধেজনক হচ্ছে। আমি বাংলা সিনেমার নামে এক পায়ে খাড়া, দেখলাম বাকিরাও ওতেই আগ্রহী (ততক্ষণে বেজার মুখে দীপাও হাজির)। মিতুসীটা কি ভুল করে ফুডকোর্টে গেলো!

পিয়ালী ফোন করছে ওকে, ফোন ছেড়ে হঠাৎ তেড়ে এলো আমার দিকে; 'কি শুনলি তুই, ও মলে ঢুকছে? কালা কোথাকার! বন হুগলী থেকে সবে বাসে উঠেছে ও।'

যাঃ কেলো! কি করা যায় শেষে পাঁচটা টিকিট কেটে আমরা আগে ঢুকে যাবো ঠিক হোল, মিতুসী এসে ফোন করলে একজন বেরিয়ে এসে নিয়ে যাবে ওকে। আমরা চারটে টিকিট দেখিয়ে ঢুকছি যথারীতি, সেটিংবাজ পিয়ালী সিকিয়রিটির মহিলাকে পটিয়ে রাজী করাল যে মিতুসী নাম বললে বিনা টিকিটেই ঢুকতে দেবে।

'টিকিটটা কি আপনাকে দেবো?'

'না লাগবে না, এমনিতেও আপনারা ছাড়া আর তিনজন দর্শক।'

কথাটা শুনে খুশী হব কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যাইহোক, সময় প্রায় হয়ে এসেছে, হলের দরজা খোলা পেয়ে আমরা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে দেখি সাদা কালো একটা ছবি হচ্ছে। সেখানে অপু দুর্গার বাবা স্টাইলে এক প্রখ্যাত অভিনেতা এক্সপ্রেসন দিচ্ছেন; এ কেমন গোয়েন্দা ছবি রে বাবা! হলে এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নেই, আমরা গিয়ে শেষ সারির দামী ঘুম পাড়ানি সোফা গুলোতে হামলে পড়লাম, আমাদের কাছে সস্তার টিকিট বলাই বাহুল্য।

বসেই পিয়ালীর চিৎকার, 'সন্দীপা কি সুইচ টিপতে হবে রে শোয়ার জন্যে?' আমি ওর থেকে তিন সীট দূরে, তাই রিলে সিস্টেমে বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

'এত করে বোতাম টিপছি, তবু কিছু হচ্ছে না রে!' পিয়ালী চেঁচিয়ে চলেছে।

ততক্ষণে অভিনেতা, চিঠিতে পুত্রের মৃত্যুসংবাদে মূহ্যমান; বৃদ্ধ কটমট করে তাকালেন আমাদের দিকে। এরপর আরও দুটো ভাবনা ভাবনা সিন, পিয়ালী প্রাণপণ সুইচ টিপে যাচ্ছে তখনও।

'এরা তো সব ধুতি পরা গ্রামের লোক, গোয়েন্দা কোনটা রে?' শর্বরী খোঁচাচ্ছে আমায়।

তারপরেই দেখি আলো জ্বলে উঠে পরদায় 'সমাপ্ত' ঘোষণা। ও হরি আগের সিনেমাটায় ঢুকে পরেছিলাম। সাফাই কর্মীরা ঢুকে আমাদের তাড়া লাগালো উঠে যেতে, 'ঢুকে যখন পড়েছেন, নিজেদের সীটে বসুন' আদেশ এলো।

'এত টিপছি সীট খুলছে না কেন?' পিয়ালী ভাঙা রেকর্ড।

'ওগুলো বন্ধ করা আছে, টিকিট বিক্রী হলে তবেই খোলা হয়' সাফাই কর্মীর গম্ভীর উত্তর।

এরপর সিনেমা শুরু হোল, সিনেমার কচি সাজগোজ করা বিগত যৌবনা নায়িকা (তিনি লেখিকা এবং প্রযোজিকাও) বিকট ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের ওপর ভর করে থেকে থেকে ভয় পাচ্ছেন, আর আমাদের হাসির বেগও তত তীব্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘুম পারানি সীটের দুটোতে এসে বসেছেন এক বয়স্ক দম্পতি (খবরটা পিয়ালীই দিলো, ওর পেছনেও দুখানা চোখ আছে সন্দেহ নেই)। বয়স্ক জ্যেঠুটি ঠান্ডা ঘরের আরামদায়ক সোফায় রীতিমত নাকডাকিয়ে ভাতঘুম দিতে শুরু করলেন কিছুক্ষণেই, জ্যেঠিমা স্বামীর অমানবিকতায়, নাকি নায়িকার ন্যাকামিতে বিরক্ত হয়ে জানিনা মহা রেগে খুঁচিয়ে তুললেন গোবেচারা জ্যেঠুটিকে, আর তারপরেই একটানা বাক্যবান। আমরা মহানন্দে যুগপৎ সামনে ও পেছনে সিনেমা দেখলাম; পয়সা উশুল আর কাকে বলে!

লহ প্রণাম

কয়েক বছর আগের কথা, তখন থাকি ভারতবর্ষের একপ্রান্তে একটি আধা ঘুমন্ত শহরে, তবে স্বভূমী বিরহ থাকলেও স্বজনের অভাব নেই সেখানে। বেশ কিছু বাঙ্গালী আছেন শহরটিতে, অন্তত যতজন থাকলে দূর্গাপূজো করা চলে ততজন তো বটেই। তবে বাঙ্গালীরা তো শুধু দূর্গাপূজো আর কূটকাচালিতে থেমে থাকতে পারেনা, তার সাথে চাই সংস্কৃতি; অতএব লাগাও পূজোর চারদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবার শুধু এতেও শান্তি নেই, পূজোর রিহার্সালে আধা বছর পার করা যায়, বাকিটার জন্যেও তো কিছু একটা চাই। তাই সেবছর থেকে শুরু হোল রবীন্দ্রজয়ন্তী।

তখন মার্চ মাসের শেষ, একদিন কালচারাল সেক্রেটারি মশাই আমাকে ফোন করে বললেন যে তিনি এবারের রবীন্দ্র অনুষ্ঠানের স্ক্রীপ্ট লেখার সুযোগ দিতে চান আমাকে। শুনে বেশ অবাক হোলাম, কারণ আমি ক্লাবের নেহাতই এলেবেলে মেম্বার, তায় লিখতে পারি এমন কথা বলিনি কখনও। যাইহোক, সেক্রেটারী বাবু পরেরদিন বাড়িতে এলেন এবং মুরুব্বী কায়দায় বোঝাতে বসলেন আমাকে কি লিখতে হবে। তাঁর কথায় মনে হোল স্ক্রীপ্ট নয়, আমাকে রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনা করতে হবে; তাতেই নিস্তার নেই, সেই জীবনীতে আমাদের হিপি ছাঁট চুল ৯০ র দশকের বলিউডি মনোভাবাপন্ন সেক্রেটারী বনলতা সেন ঢোকাতে চান। এহেন বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে, কি করি একটা বুদ্ধি মাথায় এলো; বললাম এসব তো খুবই সাধারণ, সকলেই এভাবে করে, আপনি একটু অন্যরকম করুন। তিনি আগ্রহ দেখালেন, বললাম পূজারিনী কবিতাটা নাটকের মত করে অভিনয় করান।

‘তাহলে স্ক্রীপ্ট লিখে দাও।’

‘সেকি এতে আবার স্ক্রীপ্ট কি, রবীন্দ্রনাথই তো যা লেখার লিখে গিয়েছেন!’ আমি আঁতকে উঠি।

‘আরে ওই কবিতা লোকে বুঝবে না, তুমি সুন্দর করে লিখে দাও বরং’, সেক্রেটারী অনায়াসে ব্যক্ত করেন।

কবিতা না বুঝলে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দরকার কি? কথাটা মুখে এলেও গিলে নিই; কবিতার সাথে সাথে কথ্য ভাষায় গল্পটা জুড়ে দিই অগত্যা জনগনের স্বার্থে। এরপর তিনি আমায় অনুরোধ করলেন গান পছন্দ করে দিতে, আমি গানের তেমন কিছু বুঝিনা, তাও গল্পের সাথে তাল মিলিয়ে কয়েকটা পূজা পর্যায়ের গান পছন্দ করে দিলাম।

'এ তো সব প্যানপ্যানানি!', বলে সেগুলো নাকচ করলেন সেক্রেটারী।

বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম আমি, বললাম 'আপনার যা ঠিক মনে হয় তাই রাখুন, তবে দয়া করে রবীন্দ্রসঙ্গীতই রাখবেন, কুমার শানু টানু ঢোকাবেন না।' এরপর আর কিছু জানিনা, একেবারে সেই অনুষ্ঠানের দিন সৌভাগ্য হোল পূজারিনী দেখবার।

নাটক শুরু হল, প্রথমেই প্রোজেক্টরের স্ক্রীনে ফুটে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ, বেজে উঠলো মিউজিক। লোকমুখে শুনেছিলাম, সেক্রেটারী মশাই যৌবনকালে মুম্বাই পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন ফিল্ম ডিরেক্টর হবেন বলে, কিন্তু কষাই বাপের শাসানিতে পেরে ওঠেননি; সে শখ তিনি মিটিয়ে নেন ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তাই এই বার ফিল্মি কায়দায় স্ক্রীনে ভেসে উঠল কলা কুশলীদের নাম ঠিক সিনেমার মতই। তারপর শুরু হোল নাটক, একজন ভাষ্যপাঠ শুরু করলেন, কিন্তু বিকট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জেরে কিছুই প্রায় কানে পৌঁছল না আমাদের। এবার পাঠের মাঝখানে গান, আর তার সাথে দাসী শ্রীমতীর নাচ। গানটি একটি পরিচিত তালের গান, কিন্তু বিচিত্র মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টের দাপটে সেটি চিনে উঠতে বেশ সময় লাগল; গান শুরু হতে বিয়ের কনের সাজ সেজে স্টেজে ঢুকলো শ্রীমতী, সাথে চকমকে ঘাগরা পরা কয়েকজন সহচরী (ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার গোছের)। তাদের অঙ্গ দুলিয়ে দুর্বার নৃত্য দেখতে দেখতে মাথাটা কেমন ঘেঁটে গেলো, এদিকে পাশে বসা এক দাদা মন্তব্য করলেন, 'স্ক্রীনে যে শার্ট প্যান্ট!' তাকিয়ে দেখি, পেছনের স্ক্রীনে আধুনিক পোশাকে একটি লোক দুহাত তুলে আকাশের পানে চেয়ে আছে, তখন গান চলছে 'এই আকাশে আমার মুক্তি...।' অবশেষে, শেষ দৃশ্য, রাজার সেনা রে রে করে রঘু ডাকাত স্টাইলে তেড়ে আসছে শ্রীমতীর দিকে, ঘাড়ে কোপ পড়ল বলে; আর সেই আনন্দে শ্রীমতী গেয়ে উঠল 'মন মোর মেঘের সঙ্গীতে...' সাথে দুলে দুলে নাগিন ড্যান্স অনেকটা শ্রীদেবী স্টাইলে, শুনেছিলাম সেক্রেটারী পত্নী নাকি কোরিওগ্রাফি করেছেন ইউটিউব দেখে। এরপর, কৃপাণের ঘা খেয়ে শ্রীমতী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ভেসে এলো 'আআআআ!' সাউন্ড এফেক্ট, অনেকটা রামসে ব্রাদার্সের হরর মুভি স্টাইলে।

নাটক শেষ হতে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, আর তারপরেই ফেটে পড়ল হল; না হাততালিতে নয়, অডিয়েন্সের অট্টহাসিতে। সেবার পুজোর অনুষ্ঠানের আগেই সেক্রেটারী দাদা রিজাইন দিয়েছিলেন পদ থেকে, বেরসিক দর্শকদের বিটলেমিতেই বোধকরি।

জঙ্গল সাফারি ও গদাযুদ্ধ

ক'দিন আগে পতিদেব ও আমি জনা চারেক বন্ধু সমেত গেছিলাম কেনিয়ার জঙ্গলে; আমার জঙ্গলযাত্রা এই প্রথম, তাও একেবারে রোমহর্ষক মাসাইমারা, এ যেন একলাফে গাছে ওঠা। চারজনের মধ্যে দুজন বন্ধু ফোটোগ্রাফার; পতিদেবও ইদানিং ওইদলে নাম লিখিয়েছেন, অতএব সাফারি সফরের রোমাঞ্চ যে কি, সে বিষয়ে সম্বৃদ্ধ হতে হতে পৌঁছে গেলাম নাইরোবি। এয়ারপোর্টে হাজির গাইড কাম ড্রাইভার কাকা (না আমার খুড়ো নয়) সাফারি জীপ সাথে নিয়ে; শুনলাম এই বাহনই সামনের সাতদিন হবে আমাদের পীঠস্থান। ও হরি, মাথাখোলা হাড়গিলে এই জীপে সারাদিন চেপে থাকলে পীঠের স্থানে কি অবশিষ্ট থাকবে ভেবে আমি ততক্ষণে হতভম্ব।
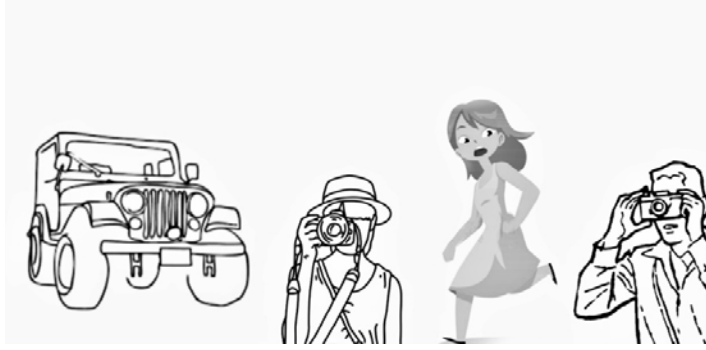
যাইহোক, ভোর না হতেই প্রতিদিন বালিশ কাঁধে ফোটোগ্রাফারের দল (ওঁদের দাবি ওগুলো বিন ব্যাগ) জীপের পশ্চাদপট দখল করেন; বাকি দুই আনাড়ী সাথী নিরাপদ দূরত্বে সামনের দিকের সিটে, মুশকিল হোল আমাকে নিয়ে। অবস্থার গতিকে আমাকে বসতে হয় ফোটোগ্রাফার দলের আওতার মধ্যে, পুরস্কার স্বরূপ কোনও জন্তু বা পাখী দেখলেই 'স্টপ স্টপ' বলে তারস্বরে চ্যাঁচানোর দায়িত্ব বর্তাল আমার ওপর। চ্যাঁচাতে আমি চিরকালই ওস্তাদ, কিন্তু গোল বাধল অন্য জায়গায়। ফোটোগ্রাফারের দল গদাধারী ভীমের মত গদা, থুরী ক্যামেরা উঁচিয়ে সারাক্ষণ আস্ফালন করেন, একটা কিছু দেখা গেলো কি গেলোনা, তাঁদের রণহুঙ্কারে আমি তটস্থ! একদিন ঝোপের ধারে দেখা মিলল সিংহমামার, একটা নয় গোটা তিনেক (জঙ্গল তো নয় মামার বাড়ী!); ফোটোগ্রাফার বাহিনী যথারীতি উত্তেজিত, নিজের মোবাইলে জানলা দিয়ে একটা ছবি তোলার চেষ্টা করতেই পতিদেবের গদারূপী ক্যামেরার বাড়িতে আমার ডান হাত অবশ।

'এত নড়াচড়া করলে এই হয়' স্বান্তনা বাক্য নয়, খ্যাঁকানি কানে এলো।

কিছুদূরে একটা সিংহছানা দেখে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়াতে গেছি, 'এ তো আচ্ছা বেকুব! লায়ন কাবের বদলে তোমার টুপীর ছবি নিয়ে বাড়ী যাব না কি?' এক বন্ধু হুড়ো দিতে কাঁচুমাচু মুখে বসে পড়ি।

রাস্তার দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত সাভানা ঘাসের ঢেউ, মাঝে মাঝে আকাসিয়া গাছ নয়নাভিরাম; এরই মধ্যে একটা গাছের মাথায় ঈগল দেখে যথারীতি 'স্টপ' বলে চেঁচিয়েছি। গাড়ী থেমেছে কি থামেনি, বান্ধবীর ক্যামেরা তেড়ে এলো আমার মুখের ওপর।

'ওরে মারা পড়ব যে!'

‘সাফারিতে এসব একটু সহ্য করতে হয়’, আমার আর্তনাদের উত্তর মিলল। একেই লগনচাঁদা মুখশ্রী, তায় গদাপ্রহারে তুবড়ে গেলে যে বেবুনরাও দলে নেবেনা, বোঝাই কাকে!

এদিকে আর এক গেরো সামনে বসা দাদাকে নিয়ে, ভারি গোবেচারা দাদাটি ভালো কিছু দেখা গেছে কানে গেলেই উদ্ভ্রান্তের মত তাঁর দু-ফুটিয়া আইপ্যাডটি মেলে ধরেন; এভাবে তিনি ছবি কতদূর তুলতে পেলেন জানিনা, তবে গাড়ীর সামনের কাঁচ দিয়ে খালি চোখে কিছু দেখার আশাও আমায় ছাড়তে হোল। একবার চিতা দেখা গেলো গাড়ীর সামনে, সবাই খুব উত্তেজিত; আমি অবশ্য আইপ্যাডের কালো ঢাকনার ওপর দুটো হলুদ কান দেখেই সন্তুষ্ট রইলাম। সুখের কথা এই যে, দাদা আমার, সাফারিতে বেশীরভাগ সময় ঢুলেই কাটিয়েছিলেন।

দুর্গম জঙ্গুলে রাস্তায় জীপের দোদুল দোলা, সাথে দুর্ধর্ষ ফোটোগ্রাফারদের জঙ্গী হামলা, এসব সয়ে জীবনের প্রথম সাফারি সফরের যে অভিজ্ঞতা আমার হোল, চাঁদের পাহাড়ে শঙ্করের অভিযানের থেকে তা কম কি সে! শুধু আমার অ-ফোটোগ্রাফার বন্ধুদের জন্যে একটা উপদেশ, ‘কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার চেষ্টা না করাই ভালো’; তারপরও নেহাৎ জঙ্গলে যেতে হলে সাথে বর্ম ও হেলমেট নিতে ভুলবেন না; আর হ্যাঁ বালিশও একটা নেবেন, না ছবি তুলতে নয়, পিঠে গুঁজতে কাজে দেবে।

মাসাইয়ের জঙ্গলে

কথায় বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, তা সঙ্গগুণে অতদূর না হলেও আফ্রিকার মাসাইমারা জঙ্গলে বাস করার সুযোগ আমার হয়েছিল। জঙ্গলে বেড়াতে যায় সাধারণতঃ ছবি শিকারির দল (আসল শিকার তো সেই কবেই বন্ধ হয়েছে), আর যায় প্রকৃতি প্রেমীরা; আমাকে এই দুটোর কোনও দলেই ফেলা চলে না, আমি হলাম হুজুগে বাঙালী, আমার মাসাই যাত্রাও সেই হুজুগেই। কেনিয়ার জঙ্গলে (মাসাইমারা, কেনিয়াতে) জিপে করে জঙ্গল সাফারি এক দারুন অভিজ্ঞতা, আমার কাছে অবশ্য তা নিদারুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেকথা আগেই লিখেছি। এখন বলব সাফারি বাদে আমার নিজের মত করে উপভোগ করা জঙ্গুলে অভিজ্ঞতার কথা।

মাসাইমারায় যে লজটায় আমরা ছিলাম, সেটি আসলে জঙ্গলের মাঝে একটি বড় জায়গা জুড়ে তৈরী ছোট ছোট কটেজের সারি, এছাড়াও খাওয়ার জায়গা ও অন্যান্য সুবিধেও ওখানেই কিছু দূরে দূরে তৈরী কাঠের বাংলোতে। মোটকথা, এ যেন একরকম জঙ্গলেই বাস, কোনো কাঁটা তারের বেড়া পর্যন্ত নেই লজের চারপাশে। বেড়া নেই বটে, তবে যা ছিল তা হোল ইয়া ইয়া লম্বা চেহারার মাসাই গার্ড, হাতে তাদের টর্চ আর এসেগাই (বল্লম); চেহারা ও হাবে ভাবে তারাও রীতিমত ভীতিপ্রদ, তাই ভরসা হোল যে আমারই মত জন্তু জানোয়ারেরাও তাদের ভয় পাবে। আমাদের কটেজটা ছিল একটা বড় আকাসিয়া গাছের পাশে, কিছুটা একটেরে। মাসাই গার্ড লাগেজ সমেত আমাদের ঘরে পৌঁছতে এসে হাসিমুখে জানালো, আমরা খুব ভালো ঘর পেয়েছি, আগের সপ্তাহে পাশের গাছটায় পুরো তিনদিন একটা লেপার্ড ডেরা নিয়েছিল; কপাল ভালো হলে, আমরাও এমনটা দেখতে পাবো। সারাজীবন নিজের মন্দভাগ্যের জন্য আফশোষ করেছি, শুধু সেবার মনে মনে বললাম, 'আমার পোড়াকপাল অক্ষয় হোক'।

পরদিন সকালে, আমাকে প্রায় ঘেঁটি ধরে বন্ধু ছবি শিকারীর দল জীপে চড়ে সাফারিতে নিয়ে গেলো, পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন আমি মোটেও ইচ্ছুক ছিলাম না; কিন্তু না চাইলে কি হয়, জোর করে পরের উপকার করার লোকের অভাব অন্তত আমাদের বঙ্গদেশে নেই। ঘন্টা চারেক যুদ্ধযাত্রার পর লজে ফিরে আমি তো বেতো ঘোড়া, শুনলাম দুপুরের খাবার খেয়ে নাকি আবার সাফারি। এরপর আমাকে আর ঠেকিয়ে রাখা দায়, ফাঁক পেয়ে সেঁধোলাম গিয়ে লজের সবচেয়ে নির্জন কোণে একটা ওয়াচ টাওয়ারের টঙে। এক জাপানী

সাহেব (আমার চেয়ে ফর্সা সবাই আমার কাছে সাহেব) ভিন্ন সেখানে আর কেউ নেই; পাশেই একটা ডোবায় কতগুলো গোদা জলহস্তি ঘাঁই মারছে, চিড়িয়াখানায় ঢের দেখেছি এদের, তাই দেখে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। পাশেই বিশাল চারণভূমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে একপাল বনমহিষ, নোংরামাখা চেহারায় বেশ একটা খাটাল খাটাল ব্যাপার আছে এটা মানতেই হোল। সাহেব দেখি ক্যামেরা বাগিয়ে সেই খাটাল মার্কা মোষের ছবি তুলতে ব্যস্ত; পরিচ্ছন্নতার প্রতিভূ জাপানী জাত, এই মাছি ভন ভন কাদামাখা মোষের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য খুঁজে পেলো তা সেই জানে।

যাইহোক, খানিক পরে সাফারি বাহিনী বিদেয় হয়েছে আন্দাজ করে গুটি গুটি লাউঞ্জের দিকে এগোলাম, খাওয়ার ঘরের মুখে হোটেল ম্যানেজারের সাথে দেখা; বলে রাখি ম্যানেজার ভদ্রলোক এক ভারতীয় যুবক, আমাদের দেখে ভারি খুশী হয়ে আগের দিন যেচে আলাপ করেছিলেন। ভদ্রলোককে দেখে আজ মনে হোল কেমন কাছাখোলা দশা, কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক নিঃশ্বাসে যা বলে গেলেন তাতে আমার রক্ত হিম। সেদিন সকালে তিনি ডিউটিতে আসবেন বলে নাকি সবে ঘরের কবাট খুলেছেন, সামনের রোয়াকে গুড মর্নিং করতে দাড়িয়ে ছিল একটা গোদা সিংহ! ম্যানেজার সাহেব কোনক্রমে দরজা বন্ধ করে তখনকার মত রেহাই পেয়েছিলেন, এর আগে নাকি চিতাবাঘের সাথে মোলাকাৎ হয়েছিল এইভাবে।

'কাউকে বলবেন না, আমি এখান থেকে না বলেই পালাবো সামনের মাসে, ঠিক করে রেখেছি', ফিসফিসিয়ে জানালেন ভদ্রলোক। সাথে আরো জানালেন, দু দু বার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মাসাইমারার জঙ্গলে চাকরী করেন জেনে।

'সত্যি, না পালালে আর ওঁর গতি কি!' মনে মনে আমিও দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

নিজের দুঃখের কাহিনী কবুল করে হালকা হয়ে ম্যানেজার আমাকে নিয়ে পড়লেন, মানে আমি অমন হারা উদ্দেশ্যে ঘুরছি দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হাতে কাজ নেই যখন আপনি বরং নেচার ওয়াকে যান, দারুণ অভিজ্ঞতা হবে'; কিছু করার নেই বুঝে পরামর্শ দিলেন তিনি।

তারপর আমার মতামতের তোয়াক্কা না করে একরকম ধরেই নিয়ে গেলেন, রিসেপশনে কর্মরত এক দৈত্যাকার মাসাইয়ের কাছে।

'কাটাকাশি, ফ্রি হয়ে এঁকে নেচার ওয়াকে নিয়ে যাও, উনি জঙ্গল ভালোবাসেন', কথা শুনে হাসবো না কাঁদবো ভেবে পাচ্ছি না কাটাকাশি গম্ভীর ভাবে সঙ্গে যাবার ইশারা করে বাইরের দিকে এগোল।

লজের গেটের কাছে পৌঁছতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে সে আর একটি মাসাইয়ের সাথে নিজস্ব ভাষায় কিছু জল্পনা শুরু করল, মানে না বুঝলেও বার কয়েক সিম্বা শুনে বুঝলাম সিংহের অবস্থান নিয়ে আলোচনা চলছে।

আমি মনে মনে উত্তেজিত, 'এ নিশ্চই সকালের সেই গোদাটা, নির্ঘাত ওঁৎ পেতে আছে কোথাও।

'কাছে পিঠেই আছে বুঝি? তাহলে নাহয় নাই গেলাম আজ', আলোচনা থামতে আমি বলি।

'আরে না না, একটা সিংহ পরিবার কাছেই থাকে, কোথায় গেলে দেখা পাওয়া যাবে তারই খোঁজ নিচ্ছিলাম'।

শুনে আমার বুক ধরফর, কান কটকট; এর থেকে তো সাফারিতে গদার গুঁতোও ভাল ছিল। লজের বাইরে বেরিয়ে, কাটাকাশি তার হাতের অস্ত্র নিয়ে বীরদর্পে এগোয়, আমি ঘেয়ো কুকুরের ন্যাতানো লেজের মত পিছু নিই। তবে খানিকদূর গিয়ে তাকে একটু দ্বিধান্বিত দেখায়।

'তুমি গাছে উঠতে পারো?' কাটাকাশির প্রশ্ন শুনে আঁতকে উঠি।

'কই নাতো?'

'হুমম...দেখে তো মনে হচ্ছে দৌড়েও তেমন সুবিধে করতে পারবে না', আমাকে একবার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে মন্তব্য করে সে।

'হ্যাঁ সেইজন্যেই বলছিলাম, সিংহ, না হয় বাদ থাক' আমি সুযোগ বুঝে চাল দিই।

'আরে, সিংহ না, আমি ভাবছি বনমহিষের কথা'।

'মোষ'! আমার বিস্ময় মাত্রা ছাড়ায়, খাটাল মার্কা মোষগুলোকে নিয়ে ভাবার কি আছে আমি ভেবে পাইনা।

'আরে, মাসাইয়ের জঙ্গলে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ওই বনমহিষ; একবার তাড়া করলে তোমাকে গুঁতিয়ে পেটফুটো না করে ছাড়বে না।

'সেকি! তাহলে উপায়!!'

'উপায় একলাফে গাছে উঠে পড়া, তা তুমি তো সেসব পারবে না; সেক্ষেত্রে মোষ তেড়ে এলে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। তাহলে সে শিং নিয়ে তোমাকে খানিক খোঁচা খুঁচি করলেও পেটের নাগাল না পেয়ে ফিরে যাবে'।

'ও আচ্ছা' আমি ততক্ষণে মিয়োনো মুড়ি।

'আর হ্যাঁ, শোন, জলহস্তিও তাড়া করতে পারে, ওদের থেকে বাঁচতে অন্য ব্যবস্থা'।

'কিন্তু, জলহস্তি তো শান্ত জীব, চিড়িয়াখানায় দেখেছি সারাদিন জলে ডুবে ঘুম দেয়, সাত চড়ে রা নেই'।

'সেটা চিড়িয়াখানায়, এখানে নয়।' দেখলাম কাটাকাশি আমার অর্বাচিনতায় রীতিমত বিরক্ত।

'এখানে ওরাও তাড়া করে নাকি?'

'জলহস্তী রেগে গেলে জঙ্গলের সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী; ওর যদি মনে হয় তুমি ওর জলযাত্রায় বাধা দিচ্ছ তবে তেড়ে এসে কুটিকুটি করবে তোমায়। দাঁত দেখেছ ওদের?'

হ্যাঁ, আজ ডোবার জলে হাই তোলা হিপোর দাঁত দেখেছি বটে, দাঁত তো নয়, যেন একেকটা বল্লমের ফলা!

মিনমিনিয়ে জানতে চাইলাম 'তাহলে কি এবারেও উপুড় হয়ে শুতে হবে?'

'না উপুড় হয়ে শুলে জলহস্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে প্রথমে সোজা করে নেবে, তারপর তোমায় কুটিকুটি করে জলে চলে যাবে'।

'কিন্তু ওরা তো বৈষ্ণব, মানে ভেজেটেরিয়ান!'

'তোমাকে কি ওরা খাবে নাকি? শুধু দাঁতে কেটে চলে যাবে মাত্র।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায়টা খুবই সহজ, অত ঘাবড়াচ্ছো কেন? হিপো যখন দৌড়ে আসবে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর যেই খুব কাছে এসে পড়বে, অমনি লাফ দিয়ে ডান বা বাঁ দিকে দৌড়বে। হিপো তার গোদা শরীর নিয়ে আর তখন বেঁকতে পারবে না, সোজা বেরিয়ে যাবে'।

কাটাকাশির সহজ উপায় শুনে আমি ততক্ষণে বাক্যহারা; তেড়ে আসা দূরন্ত হিপোর সামনে স্থির থাকতেই যদি পারব, তাহলে কি আর এই ভেতো জীবন কাটাই! এরপর সে জানালো বুনো হাতির পাল থেকে বাঁচার উপায়, বলল হাওয়ার গতি বুঝে সে নিজেই সরিয়ে নিয়ে যাবে আমায়। সাথে অবশ্য এটাও জানালো যে, লেপার্ড সামনে পড়ে গেলে ঈশ্বরই ভরসা, লাল পোশাক পরা মাসাইদের ওরা ঘাঁটায়না, তবে আমার কপালে কি আছে বলা মুশকিল।

'প্রার্থনা কর, যেন লেপার্ডের মুখোমুখি না হতে হয়'।

কাটাকাশির স্পষ্ট জবাবে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে প্রায়। বেঁচে ফেরার আসা একপ্রকার নেই জেনেই, জিজ্ঞাসা করলাম, 'সিংহ এলে কি করতে হবে?'

'সিংহ এলে মোবাইলে ছবি তুলবে, চাওতো সেলফিও নিতে পারো'!

'অ্যাঁ!!'

'হ্যাঁ, সিংহকে তুমি ঘাঁটিও না, সেও তোমায় ঘাঁটাবে না' কাটাকাশির মুখে অনাবিল হাসি।

এরপর নানান গাছ, মাটির গর্তে জন্তুর বাসা সেসব চেনাতে চেনাতে এগিয়ে চলল আমার রক্ষাকর্তা, জঙ্গলের রাজত্বে তার বিক্রমের কাছে নিজেকে বড্ড ফালতু মনে হচ্ছিল। তাই একফাঁকে বড়াই করে বললাম, তোমার দেশে যেমন সিংহ, আমার দেশে বাঘ, রয়াল বেঙ্গল টাইগার। শুনে সে বলল, তার বাঘ দেখার ভারি ইচ্ছে। বাঘ দেখতে হলে, এসো আমার দেশে জানালাম। এক সময় কাটাকাশি বলল, হোটেলে কাজ করে বেশী রোজগারের তাগিদে, না হলে গ্রামেই ফিরে যেত।

'তা, আমরা যে যা করি সে তো রোজগারের তাগিদেই' আমি দার্শনিক মন্তব্য করি।

'তুমি বুঝতে পারোনি, বয়স তো হয়েছে, তবু এখনও বৌ জোগাড় করতে পারিনি, তাই পয়সা জমাচ্ছি', কাটাকাশি আমাকে বোঝায়।

অবিবাহিত লোকের পয়সার এত কিসের দরকার আমি বুঝতে নারাজ, যতদূর জানি, বিয়ে করেই লোকে দয়ে পড়ে, পয়সার তখনই প্রয়োজন। আমার ভ্যাবলামো দেখে রীতিমত বিরক্ত কাটাকাশি।

'পয়সা না জমালে, পণ দেবো কি করে শুনি? আর পণ না দিলে বৌ জুটবে আমার?' খিঁচিয়ে ওঠে সে।

লোকটা বলে কি! সিংহের সাথে সেলফির প্রস্তাবেও তত অবাক হইনি, যতটা এখন হলাম। না পেরে, বলেই ফেললাম আমার কাছে এ তো উল্টো পুরাণ!

'তোমাদের দেশে পণ না দিলেও মেয়ে পাওয়া যায়?' কাটাকাশিও আমার মতই হতভম্ব। 'তোমার দেশের মেয়েরা বিদেশীদের বিয়ে করতে রাজী হয়?' খানিক চুপ করে থেকে জানতে চাইল সে।

বিদেশীদের বিয়ে করতে চাইলেও, মাসাই বিয়ে করে, এমন ভয়াবহ জঙ্গলে থাকতে রাজি হবে কেউ সে আশা তাকে দিতে পারিনি সেদিন।

'যাবো তোমার দেশে, শিগগিরি', বিদায় নেবার সময় বলল কাটাকাশি।

সেটা বাঘ দেখার আশায়, না পাত্রী জোটাতে, ঠিক পরিষ্কার হোল না আমার কাছে।

***

সন্ধ্যের মুখে ছবি শিকারী বন্ধুরা মহা দর্পে ঘরে ফিরলেন, একটা গোটা সিংহ পরিবারের ছবি তুলতে পেরে আমাদের দলপতির তখন কি দাপট!

'তুমি তো কোনই কম্মের না, সঙ্গে গেলে সিংহ গুলো দেখতে পেতে কাছ থেকে অন্ততঃ', দলপতি বন্ধু হুঙ্কার ছাড়লেন।

এরপর যাওয়া হোল বুশ ডিনারে, অর্থাৎ হোটেলের খোলা জায়গায় আমাদের ছজনের গ্রুপের প্রাইভেট রাতভোজন; হোটেল ম্যানেজারের দাক্ষিণ্যেই এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল, বলা বাহুল্য। বেশ গা ছমছমে পরিবেশ, মাঝখানে জ্বলছে বড় অগ্নিকুন্ড, চারপাশে কয়েকজন মাসাইগার্ড, তাদের হাতে রাইফেল, খাওয়া দাওয়া এলাহি। এরিমধ্যে গল্প জুড়লেন ম্যানেজার, তাঁর কাছেই জানলাম মাসাইরা কাউকে পছন্দ করলে তার প্রতি ভীষণ অনুগত থাকে আজীবন। আরো শুনলাম, হোটেলের কোনও অফিসারকে পছন্দ না হলে, রাতের বেলা ঘরে ঢুকে বামাল সমেত অফিসারটিকে জীপে করে ছেড়ে দিয়ে আসে নাইরোবির দু কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে।

'একটু সাবধানে এদের সাথে কথা বলবেন', জানালেন ম্যানেজার।

আমাদের দলপতি দেখলাম বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন, সকাল বেলা সাফারিতে মাসাই ড্রাইভারকে জঙ্গল নিয়ে জ্ঞান দিতে গিয়ে বেশ চটিয়েছিলেন তিনি।

ঠিক এই সময় হঠাৎ, দশদিক কাঁপিয়ে হৈ হৈ করতে করতে আমাদের আসরে ঢুকে পড়ল একদল মাসাই; যুদ্ধপোশাক আর হাতের বল্লমে যেন সাক্ষাৎ একেকটা যমদূত। আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব লক্ষ্য করে হাসিতে ফেটে পড়ল তারা, আর সেই সাথে শুরু করল মাসাই নৃত্য; বুঝলাম এটাও রাতভোজনের একটা অঙ্গ। মাসাই নাচ, মানে কে কত উপর অবধি লাফাতে পারে; তাদের দেখে উৎসাহ পেয়ে আমিও যোগ দিলাম লম্ফনাচে (নিজের দেশে তো এ সাহস হবে না কোনোদিন তাই)। গোলমাল থামতে দলপতি

বন্ধুর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, বীরপুঙ্গব জঙ্গলবিশারদ চেয়ার উল্টে মাটিতে পরে আছেন; শেষে জল বাতাস করে জ্ঞান ফেরাতে হল তাঁর।

এরপর দলপতি মশাই মাস ছয়েক কোনও যোগাযোগ রাখেননি বাকিদের সাথে, একথাও জানিয়ে রাখি।

ম্যাসাজ মহিমা

ব্যাংককে থাকতে যাচ্ছি জানালে প্রথমেই যে কথাটা সবাই বলে ওঠে, তা হোল ‘আরে ম্যাসাজের জায়গা, খুব ভালো’, শুনে শুনে মনে হতে লাগলো যেন ওদেশে কাজকর্ম শিকেয় তুলে, খালি ম্যাসাজ করালেই চলে। অবশেষে একদিন সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে পৌঁছানো গেলো, দেখি ভাষা না বোঝা গেলেও লোকজন খুবই কর্মনিপুণ; চটপট ইমিগ্রেশান, লাগেজ পেরিয়ে এগোতেই চোখে পড়ল সারথী হাজির হাতে প্ল্যাকার্ড ও মুখে হাসি নিয়ে। গাড়ীতে উঠতে, আধো আধো ইংরেজী বুলিতে সে জানিয়ে দিলো গাড়ীর সিটে ম্যাসাজের ব্যবস্থা আছে; আমি চমৎকৃত, এ যে সত্যিই ম্যাসাজের দেশ!

কদিন নানান কাজের ব্যাস্ততা পেরিয়ে এক রোববারের সকালে কর্তা বললেন, চলো ম্যাসাজ করাতে যাই আজ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পান বিড়ির দোকানের মত সারি সারি ম্যাসাজ সেন্টার সুকুম্ভিতে (আমরা ওখানেই থাকি), যা হোক, তাও কাছেই একটা বড় সেন্টার আসতে যেতে চোখে পড়ে, বললাম ওটাতেই যাই চলো। সেন্টারের রিসেপশনে বসা মহিলা মিষ্টি হেসে প্রায় এনসাইক্লোপেডিয়ার মত গোবদা একটা রংচঙে বই ধরিয়ে দিলেন, পড়াশোনা করতে হবে ভেবে ঘাবড়ে যাচ্ছি, পাতা খুলে বুঝলাম এ হোল ম্যাসাজনামা। খুঁজে পেতে তার ভেতর থেকে একটা কাঁধের ম্যাসাজ পছন্দ করলাম (আমার একটি কাঁধ বেশ কিছুদিন ধরেই জমাটবদ্ধ), কর্তা নিলেন সনাতনী ম্যাসাজ। দুজনকে একসাথে নিয়ে গেলো একটা কেবিনে, সেখানেও হাসি মুখে দুই মহিলা কাপড় বদলে শুয়ে পড়তে বললেন। আমার তো কাঁধ, শুতে হবে কেনো ভাবছি, ভাষার বিভ্রাটে জিগ্যেস করার উপায় কোথায়! ঝামেলায় না গিয়ে শুয়ে পড়তেই, যা শুরু হল তার সাথে ধোবিঘাটের কাপড় নিঙরানোরই কেবল তুলনা করা চলে; না আর একটা তুলোনাও খাটে। বাবা রামদেব টিভি চ্যানেলে স্বেচ্ছায় যেসব শরীরী মারপ্যাঁচ করে থাকেন, আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছুক হাত পা গুলোকে নিয়ে ঠিক সেসবই করা হতে থাকলো; তবে হ্যাঁ মহিলাদ্বয়ের মুখের অমায়িক হাসিটুকু কিন্তু লেগেই ছিল সর্বক্ষণ। ঘন্টা খানেক ধরে চলল এই কোস্তাকুস্তি, আমার তখন মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করারও ক্ষমতা নেই, হাত পা গুলো আর নিজের বলে ভাবতে পারছি না। অবশেষে গরম সেঁক (মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা টাইপ) দিয়ে শেষ হল ম্যাসাজ। কম্পমান কলেবরে রিসেপশনে ফিরতে ধরিয়ে দেয়া হল ভেষজ চা। মিথ্যে বলব না, চা টা খেয়ে বেশ ফুরফুরে লগলো, সেন্টার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখি শরীরটাও লাগছে ভারি ঝরঝরে।

ঘরে ফিরে কর্তা বললেন, 'আবার যাবে তো?' আবার যাবার সাহস হবে কিনা জানিনা, তবে শ্যামদেশীয় (থাইল্যান্ড) আড়ং ধোলাইয়ের যে মহিমা আছে সেকথা স্বীকার করতেই হল।

চুল বাহার

কর্তার চাকরীর গুঁতোয় ব্যাঙ্ককে আসা স্থির হোল যখন, বন্ধুরা শুনে হুড়ো দিল, ‘দারুণ জায়গা খুব মজা করবি, মল, রেস্তোঁরা, ম্যাসাজ পার্লার আরো কত কি’! তাদের উৎসাহ দেখে আমার মনটাও ফুরু ফুরু। শেষমেষ আসা হল ব্যাঙ্ককে, বাড়ী টাড়ি গুছিয়ে থিতু হতে লেগে গেলো কয়েক মাস। এর মধ্যে অনেক ঠেকে একটা জিনিষ বুঝলাম যে, জায়গাটা দারুণ বটেই, তবে তা টুরিষ্টদের জন্যে; আর নিদারুণ তাদের জন্যে যারা এখানকার বাসিন্দা অথচ থাই ভাষা মোটেও জানেনা। থাইল্যান্ড কোনোকালেই বিদেশীদের উপনিবেশ ছিলনা, ফলে ভিন্ন ভাষা শেখার তাগিদও তাদের নেই; অতএব এখানে টিঁকে থাকতে গেলে থাই শেখো, নতুবা নাকাল হও।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যপারটা বেশ খোলসা হবে। সুপার মার্কেটে গেছি একটা ছোট মই কিনতে, বিস্তর চেষ্টা করেও বোঝাতে পারছিনা, শেষে ভাবলাম বেশ ডাম্বশেল হার্ট স্টাইলে অভিনয় করে দেখাই। দোকান ভর্তি লোকের সামনে হাঁচোড় পাঁচোড় করে মইয়ে ওঠার ভঙ্গী করলাম, তারপর মইয়ে উঠে ঝুল ঝাড়ার ভঙ্গী সেও বাদ দিলাম না; দেখলাম আমাকে ঘিরে বেশ একটা ছোটখাটো জটলা তৈরী হয়েছে, সবাই মুগ্ধ হয়ে আমার কাণ্ড দেখছে। মনে মনে বেশ একটু আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি যে অভিনয় ভালই করেছি; পরক্ষণেই মেয়েটি একগোছা মোটা দড়ি নিয়ে এসে হাজির, সেই মূহুর্তে নিজেকে চিড়িয়াখানার বাঁদর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না; আমার অভিনয় দেখে মেয়েটি ওই দড়িতেই ঝুলে পরতে পরামর্শ দিলো না তো? কেমন সন্দেহ হল মনে মনে।

তা এভাবেই চালাচ্ছি কোনোক্রমে, না চালিয়ে উপায় নেই; তাদের খটমট ভাষা এবং অদ্ভুত উচ্চারণের গুঁতোয় দুএকবার শেখার চেষ্টা করে রণেভঙ্গ দিয়েছি। সামনেই বোনপোর বিয়ে, কোলকাতায় যেতে হবে, যাবার আগে ধোপদুরস্ত হওয়া চাই; শুনলাম বোনটি আমার কুটুম বাড়িতে গেয়ে রেখেছে, ‘দিদি থাকে ব্যাঙ্ককে, সেখানকার রকমসকমই আলাদা’।

কি করি, বাড়ির কাছাকাছি একটা পার্লারে গেলাম, ঢোকার সময় জেনে নিলাম ইংরেজি জানা হেয়ার স্টাইলিস্ট আছে কিনা (এখানে নাপিতদের তাই বলে)। মস্ত করে ঘাড় নেড়ে, আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চুলোচুলি (শ্যাম্পু) করতে। আসলে এরা চুল ধোয়ার সময় শ্যাম্পু লাগিয়ে রীতিমত আটামাখা স্টাইলে ম্যাসাজ করে মাথায়, ঘিলু টিলু ঘেঁটে আমার কাছে সেটা প্রায় চুলোচুলিরই সামিল। যাইহোক, সেসব পাট চুকতে বেশ একটি পুতুল পুতুল চেহারার মেয়ে মিষ্টি হেসে কাঁচি নিয়ে তেড়ে এলো, আমি তড়িঘড়ি

বোঝাতে চাইলাম, ঠিক কি চাইছি। মেয়েটি বেশ মন দিয়ে শুনে বারকয়েক ঘাড় নেড়ে, প্রথমেই মাথার পেছনের চুলে লাগালো এক কোপ একেবারে ঘাড় চেঁছে।

'একি! একি!', তখন মাতৃভাষাই সম্বল। আমার মরণপন আর্তনাদে একটুও না ভড়কে সে লেগে রইল আমার কেশবিন্যাসে; এই বিন্যাসে যে আমার কত বড় সর্বনাশ তা বোঝানোর চেষ্টা ততক্ষণে আমি ছেড়েছি। প্রায় শহীদ হবার মানসিকতায় বুকবেঁধে বসে রইলাম চুপ করে, আয়নার দিকে তাকানোর সাহস আর বাকি নেই তখন। চুল কাটা শেষে হতে আধো আধো বুলিতে সে জানালো 'ফিনিশ'।

ফিনিশ তো বটেই, তবে সে আমি। দেখলাম মাথায় ব্যাঙের ছাতা পরে একটা অদ্ভুত জন্তু আয়না দিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর তারপরেই নাপতেনি কন্যে আমার মুখটা বেশ করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল, 'নো গুড'!

থাইরা সরল এবং স্পষ্টবাদী, সেদিন একথা মরমে মরমে উপলব্ধি করলাম। শুধু তাই নয়, বিল মেটানোর সময় মেয়েটি জুলু জুলু চোখে পাশে দাঁড়িয়ে রইল, ফলে অতবড় সর্বনাশের পরেও তাকে বখশিস দিতে হল বেশ কিছু। দরজা খুলে বেরিয়ে আসছি, গেটে পাহারারত দারোয়ানজী হাসি হাসি মুখে সেলাম ঠুকলো; লক্ষ্য করলাম, তার চুলের স্টাইলটিও হুবহু আমারই মত।

বাড়ী ফেরার পথে তখন আমার একটাই চিন্তা, বিয়েবাড়ীতে এই রূপ নিয়ে হাজির হলে বোনপোর বিয়েটা না ভেস্তে যায়; বংশে পাগল কেউ আছে জানলে অনেকেই বিয়ে দেয়না কিনা!

দাঁড়ে দাঁড়ে দুম্
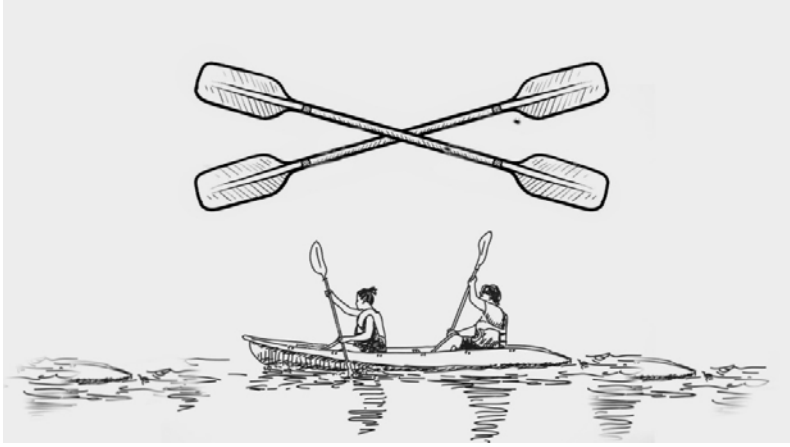
ভিয়েতনাম বেড়াতে গেছি আমরা কর্তা গিন্নি; আমার উদ্দেশ্য চম্পার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া, কর্তা চান ছুটিতে কদিন গা এলাতে, তাই সেই সাথে হ্যালং বে তে দুরাত্রির নৌযাত্রা প্রমোদ তরণীতে। নৌযাত্রায় নানান বিনোদন, তার মধ্যে একটি হোল কায়াকিং অর্থাৎ ছোট ছোট নৌকায় নিজে নিজে দাঁড় টেনে নৌকাবিহার।

সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে জাহাজের গাধা বোটে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হোল আলাদা একটি জায়গায়, যেখানে মাঝ সমুদ্রেই পাটাতন বানিয়ে গুচ্ছের প্লাস্টিকের হালকা নৌকা সাজিয়ে তৈরি হয়েছে কায়াকিং সেন্টার। যাওয়ার আগে বলা হয়েছিল সাথে আর এক সেট কাপড় নিতে।

'শান্তিমত দাঁড় টানলে জল ছিটবে না, তুমি দয়া করে নাচানাচি কোর না' কর্তার কথায় আস্বস্ত হলাম। বিয়ের পরে যদিও দেখিনি কখনো, তবে মনে হল উনি এব্যাপারে অভিজ্ঞ, আমার অবশ্য এটাই প্রথমবার।

যাইহোক, লাইন দিয়ে দাঁড় সংগ্রহ করলাম, কর্তা পছন্দ করে দুটো ম্যাচিং নীল রঙের দাঁড় নিলেন, দেখলাম এগুলো খুব হালকা অ্যালুমিনিয়ামের রড দিয়ে তৈরি, চালানো সহজ হবে, অতএব আমার উৎসাহ ততক্ষণে তুঙ্গে। একেকটি নৌকায় দুজন করে যাবে, সামনে পেছনে করে বসতে হবে।

আমাদের পালা আসতে ব্যাবস্থাপক লোকটি জানতে চাইল, 'তোমাদের মধ্যে বেশী ভাল কে জানে? সে পেছনে বসবে'।

অবশ্যই পতিদেব পেছনে বসলেন, আর আমি সামনে। আমাদের আগে যারাই নৌকায় চড়েছে, দেখছিলাম প্রথম থেকেই কোন দিকে যাবে সেই হিসেবে দাঁড় টানতে শুরু করছে।

আমরা একটু ফাঁকায় যাবো, চল বাঁ দিকটায় যাই', নৌকায় বসেই নির্দেশ পেলাম, সাথে সাথেই বাধ্য সৈনিকের মত প্রবল উৎসাহে দুহাত দিয়ে জলের মধ্যে মাছের ফাতনা নাড়ার স্টাইলে দাঁড় টানতে শুরু করলাম।

পেছন থেকে ঠেলে দেওয়ায় নৌকাটা যেটুকু এগিয়েছিল, হঠাৎ দেখি লাট খেয়ে সেখান থেকে আবার পাটাতনের দিকেই তেড়ে যাচ্ছে, আমার শত দাঁড় ঝাপটানিতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। ঠিক সেই মূহুর্তে এক বৃদ্ধ ব্রিটিশ দম্পতি নৌকায় বসছিলেন, আমাদের নৌকা গিয়ে গুঁতিয়ে দিলো তাদের নৌকাটাকে,

ফলস্বরূপ প্রচন্ড ঘাবড়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিটকে পড়ল দাঁড়; প্রাণভয়ে আমাদের নৌকটাকে প্রবলভাবে ঠেলে দিলেন উনি। আর তাতেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জলের স্রোতে পড়া গেল।

'তোমার আনতাবড়ি দাঁড় টানাতেই এমন হল' খেঁকিয়ে উঠলেন পতিদেব।

'আরে তিনশ বছর ধরে ওরা আমাদের গুঁতিয়েছে, আর এখন এমন দুএকটা ছোটখাটো গুঁতো মারা তো আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, ওতে দোষ হয়নি' আমি সান্ত্বনা দিলাম।

জলের স্রোতে তো পড়া গেল, কিন্তু প্রাণপন দাঁড় টেনেও দেখি আমাদের নৌকা আর নড়ে না। বাকিদের তরতর করে এগিয়ে যেতে দেখে, 'জোরে দাঁড় টানো না' আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'তুমি চুপ করে বসলেই এগোনো যাবে', নির্দেশ এলো। আসলে দুজন দুদিকে দাঁড় চালানোতেই ওই গোলমাল; এদিকে জল ছিটে আমার জামাকাপড় এরইমধ্যে একশা, বাধ্য হয়ে আমি ক্ষান্ত দিলাম।

এরপর দেখি নৌকটা ডানদিকে চলেছে, 'বাঁদিকে যাবো বলছিলে না?'

'এদিকটাও চলবে'। জবাব এলো, বুঝলাম ভাল নাবিকের হাতেই পড়েছি।

এভাবেই চলছিলাম বেশ, হঠাৎ আর একটা বোট সামনে এসে পড়ল, বা বলা যায় আমরাই ওদের সামনে গিয়ে পড়লাম। ওরা পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে, এদিকে আমাদের বোট ক্যাপ্টেনের যাবতীয় কাপ্তেনি ব্যার্থ করে ওদের দিকেই ধেয়ে গেল। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে চক্রব্যূহে রথের চাকা হাতে অভিমন্যুর স্টাইলে আমার হাতের দাঁড়টাকে শূণ্যে ঘোরাতে শুরু করেছি, ওদিকের নৌকোয় সামনে বসা পুতুল পুতুল চেহারার চৈনিক তরুণীর চিলচিৎকারে শান্ত পরিবেশ উত্তাল। ধাক্কা আটকানো গেলনা, তরুনীর পেছনে বসা চেংগিস খাঁয়ের রক্তচক্ষু আমার রক্ত হিম করে দিল।

'বলি করছ টা কি?' বিরক্ত হয়ে পেছন ফিরে দেখি বাঁ কাঁধ চেপে ধরে বসে আছেন ক্যাপ্টেন।

'তোমার দাঁড়ের বাড়ি খেয়ে আমি কি কিছু করার অবস্থায় আছি?' জবাব এল।

এসব গন্ডগোলে উপকার হল এই যে আশেপাশের বোটগুলো আমাদের থেকে দূরে যেদিকে পারল ছিটকে গেল, ফলে আমরা একেবারে নির্জন পরিবেশে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। সময় শেষ হয়ে আসছে, এবার ফেরার পালা; কিন্তু ফিরব কি করে জানা নেই।

'এখানেই চুপ করে এঁটে থাকি, ওরা নিজেরাই ঘেঁটি ধরে নিয়ে যাবে তাহলে' আমি পরামর্শ দেবার চেষ্টা করি।

'তোমাকে নিয়ে বেরোলেই যত অনর্থ' কর্তা খেঁকিয়ে উঠে আত্মসম্মান রক্ষা করলেন।

এতক্ষণে আমাদের গাইড হাত নেড়ে আমাদের ফিরতে বলছে দূর থেকে। আমি দেখলাম ক্যাপ্টেনের কম্ম নয় আমাকেই করতে হবে কিছু। আমিও হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলাম ফিরতে পারছি না। মেয়েটি অবস্থা কতক আন্দাজ করে কোন দিকে দাঁড় বাইতে হবে হাত নেড়ে দেখাতে শুরু করল, এবার কর্তাকে হাঁকিয়ে আমিই দায়িত্ব নিলাম দাঁড় টানার। মেয়েটির ইশারা লক্ষ্য করে হাঁচোড় পাঁচোড় করে ফাতনা নেড়ে পাটাতনের কাছাকাছি পৌঁছতে, ব্যবস্থাপক বোটের দড়ি ধরে টেনে বাকিটা সামলে নিল। পতিদেব গম্ভীর মুখে আগে নামলেন, নামলাম আমিও, তবে নামতে গিয়ে হাতের দাঁড় গিয়ে ঝাপটা মারল ব্যবস্থাপকের পশ্চাতে।

আমাদের নৌকাবিহার চিত্তাকর্ষক না হলেও বেশ লোমহর্ষক হয়েছিল (আমাদের নয়, অন্যদের জন্যে) একথা মানতেই হবে; এরপর বাকি বেলা দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল বলাই বাহুল্য।

কিমোনো কথা

চৈত্র সংক্রান্তির ছুটিতে জাপান বেড়াতে গেছি (ব্যাংককে সেসময়ে লম্বা ছুটি), বেড়াবো হপ্তা খানেক; টোকিও, কানাযাওয়া হয়ে শেষ ঠিকানা কিয়োটো। জাপান ছবির মত দেশ, প্রযুক্তিতে অগ্রগন্য, তবে তাদের ইতিহাসও সুপ্রাচীন এবং গরিমাময়। কিয়োটো পূর্বতন রাজধানী ও ঐতিহাসিক শহর, সেদেশের অতীতের সংস্কৃতি বুঝতে গেলে সেখানে যাওয়া আবশ্যক। যাইহোক, যাত্রার শেষভাগে কিয়োটো এসে পৌঁছলাম, গত কদিনের দৌড়োদৌড়িতে শরীর বেশ কাহিল, যদিও অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে মন ভরে গেছে। এখানে থাকবো কদিন, তাই কবে কি দেখব ঠিক করেই এসেছি আগের থেকে। প্রথম দিনের তালিকায় কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির, হিগাশিমায়ার পুরোনো লোকালয় ও গিয়ন অঞ্চলের গেইশা পাড়া, এই সবগুলিই শহরের মধ্যিখানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো, তাই একটি জায়গায় নেমে বাকিটা পায়ে পায়ে ঘুরে দেখব। সকাল সকাল বাসে চড়ে হাজির হলাম শোরেন-ইন মন্দিরে, এটি সেদেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধধর্মশিক্ষার কেন্দ্র। জাপানের বৌদ্ধমন্দিরগুলি কাঠের তৈরী এবং সুন্দর বাগান পরিবেষ্টিত শান্তির জায়গা, পাখির ডাক ভিন্ন অন্য কোনও আওয়াজ সেখানে নেই। মন্দিরের স্থাপত্য প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রথাগত রীতি মেনে একই ধরণের, সেখানে শিল্প ও ঐশ্বর্য্যের গরিমার থেকে বৌদ্ধধর্মের সহজ জীবনদর্শনের প্রতিফলন। শোরেন- ইন মন্দির ও তৎসংলগ্ন বাগান ঘুরে এগিয়ে গেলাম খুব কাছেই আর একটি মন্দিরে, নাম সিওন-ইন, এটি চীনা পর্যটকদের তীর্থস্থল; সেখানে বড় বড় বাসে চড়ে দল বেঁধে চীনা দর্শনার্থীদের ভীড় সেই সকাল থেকেই। তীর্থস্থল মানেই আমরা বুঝি দুর্গম ও কষ্টসাধ্য যাত্রা, সেই নিয়ম মেনে এই মন্দিরের মূল ভবনটি কয়েকশ সিঁড়ি পেরিয়ে সুউচ্চ স্থানে নির্মিত, মন্দির সংলগ্ন বাগানটিও একটি টিলার ওপর তৈরী। তবে আমার মত বেতো লোকেরা প্রবেশপথের তোরণ মন্দিরে বসে বসেও বেশ চারপাশের শোভা উপভোগ করতে পারে। মন্দির দর্শন সেরে গুটি গুটি এগোলাম মারুয়ামা-কোয়েন পার্কের দিকে, গুটি গুটি এই কারনে যে রাস্তাটা বেশ চড়াই, আর আমি ছাপোশা বাঙালী, ফিটনেস লেভেল শূণ্য।

পার্কটি সুবিশাল এলাকা জুড়ে তৈরী, সেখানকার গাছপালা বেশ প্রাকৃতিক ভাবেই বেড়ে উঠেছে বলে বোধ হয়, মানুষের সুপরিকল্পিত হাতের ছাপ নেই; অবশ্য তার জন্যে সৌন্দর্য্যের কোথাও ঘাটতি পড়েনি। মাঝে মাঝেই সাকুরা ফুলে (চেরী ব্লসম) ঢাকা গাছ, মাটি ছেয়ে আছে ঝড়ে পরা হালকা গোলাপী পাঁপড়িতে, এছাড়াও রকমারি ফুলের সম্ভারে চারিদিকে বসন্তের জয়গান। পার্কের এক কোনায় একটি সাকুরা গাছের

সামনে পা আটকে গেলো চলতে চলতে, ফুলেল গাছের নীচে ফুলের মত সুন্দরী এক কিমোনো পরিহিতা তরুণী; নানান ভঙ্গিমায় সে পোজ দিচ্ছে, আর ক্যামেরা হাতে এক তরুণ পাকা শিল্পীর মতই ছবি তুলে চলেছে একান্ত আনুগত্যে। ইচ্ছে হোল আমিও তার ছবি নিই, এতই মনলোভা সে দৃশ্য; আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এ এক অতীতের রূপকথা। কর্তার খোঁচায় সম্বিত ফিরল, অনিচ্ছা সত্বেও চলতে শুরু করলাম আবার; কিন্তু তারপরেই বিস্ময়ের শুরু। সারা পার্ক জুড়েই যে রূপকথা! কিমোনো, কাঠের চটি , ঢাউস চুলের সাজ আর রংবেরঙের ছাতা হাতে এক একটি রাজকন্যে; কেউ সহচরী সাথে, কারো সাথে বুঝি মনের মানুষ। দেখতে দেখতে আমি তো দিশেহারা, শেষে গাছপালা দেখি না এই রূপকুমারীদের! যাহোক, খানিক বাদে ক্লান্ত হয়ে বসলাম একটা বেঞ্চিতে। ‘আহা কিয়োটোর মেয়েরা ভারি ট্র্যাডিশানাল, এখনও শত অসুবিধে মেনেও কেমন জাতীয় পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়’, আমি মন্তব্য করি। দেখলাম আমার কথায় কান না দিয়ে কর্তা লক্ষ্য করছেন পাশের বেঞ্চিতে বসা প্রণয়ী যুগলকে। তাকিয়ে দেখি তারা দুজনেই মাথা থেকে পা জাপানী সাজে সজ্জিত, মেয়েটির এশিয় মুখশ্রী, ভাল করে দেখে মনে হল থাই, সাথের ছেলেটি ইউরোপীয়, সে এই জবরদস্ত পোশাক ও কাঠের থান-ইঁট মার্কা চটির চাপে চোখে মুখের গদগদ ভাব যেন ঠিক টিকিয়ে রাখতে পারছেনা। ব্যাপার কি? তাহলে কি যা দেখছিলাম এতক্ষণ সবই মেকি? এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে মনে হোল, কিমোনো পরীরা সকলেই ট্যুরিস্ট এবং এদের একটা বড় অংশ থাই। এপ্রসঙ্গে বলে রাখি, থাইরা জাপানীদের অগ্রজসম জ্ঞান করে ও নির্দ্বিধায় অনুকরণ ও অনুসরণ করে; জাপানে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী থাই ট্যুরিস্টদের আনাগোনা এবং তাদের বেড়াতে যেতে ভিসাও লাগে না। থাই মেয়েরা সাজগোজ ও ছবি তোলার নামে পাগল, দেখতেও ভারি সুন্দর হয়, বেশ পুতুল পুতুল গড়ন।

এরপরে, আমরা একটা কাফেতে ঢুকে জাপানী চা খাচ্ছি (হ্যাঁ, সে দেশে কাফেতে কফি ছাড়া আর সবই পাওয়া যায়); দেখি সেই প্রণয়ী যুগল হেঁটে যাচ্ছে সামনের রাস্তা দিয়ে। মেয়েটি হাতের ছাতা দুলিয়ে হরিণীর ছন্দে ভেসেই চলেছে একরকম; ছেলেটি একহাতে কিমোনোর বেল্টটা কোনোমতে চেপে ধরে, কাঠের চটি ছ্যাঁচরাতে ছ্যাঁচরাতে চলেছে তার পিছু পিছু। আহা! দেখে বড় মায়া হোল।

চা খাওয়া শেষে আমরা গেলাম কোডাই-জি মন্দির, এটি জাপানী বীর হিডেয়োশির স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী নেনে সতেরোশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কোডাই-জি ‘যেইন’ মতাদর্শের মন্দির, যাঁরা ভারতীয় মহায়ন পন্থায় বিশ্বাসী ও নিরামিশাষী। এই মন্দির সংলগ্ন বাগানটি একটি পাহাড়ের ওপর, সেখানে মূল মন্দির ছাড়াও ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্মৃতি শৌধ। মন্দির দেখা শেষ হতে আমরা ইশিবেই-কোজি রাস্তায় ঢুকলাম, এখান থেকে পুরোনো চত্বরের শুরু; একে অন্যের সাথে যুক্ত সরু সরু রাস্তা, আর তার দুধারে সেযুগের ধরণে তৈরী সুন্দর সুন্দর কাঠের বাড়ী। তবে বেশীরভাগ বাড়ী গুলোতেই এখন হয় রেস্তোঁরা নয়তো বাহারে দোকান। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ও ছবির মত বাড়ীঘর যেন এখনও অতীতের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতে আমিও কেমন হারিয়ে যাচ্ছি তখন। তবে বেশীক্ষণ এই ভাব বজায় থাকল না, কারণ এখানেও পালে পালে কিমোনো পরী, তাদের কেউ আবার মুখে চুনকাম করে, ঠোঁটে লাল রং এঁকে গেইশা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কানাযাওয়াতে সত্যিকারের গেইশাদের আতিথ্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাই এই নকল গেইশাদের সাজ দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলামনা। এদের এেকেকজন সাজুগুজু করে হাটিহাটি পা-পা করে এগোচ্ছে (তার বেশী ওই চটিতে সম্ভব নয়) আর পেছনে ফেউয়ের মত কিছু ট্যুরিস্ট লেগে রয়েছে ছবি বা ভিডিও তোলার আশায়, বেচারা বাবা মায়েরাও রয়েছে সেই দলে; মেয়ের শখ পুরণ করতে গিয়ে তাদের জেরবার দশা। এসবের মাঝখানে পড়ে আমিও কখন এদেরকেই লক্ষ্য করতে শুরু করেছি বুঝতেও পারিনি। দেখি একটা রাস্তায় দুই বান্ধবী চলেছে, একজনের বয়কাট চুলে বেমানান ফুলের গয়না ও খোঁপার কাঠি বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে রয়েছে, মেয়েটিও ঘার বেঁকিয়ে সেই কেশসজ্জা ব্যালান্স করতে করতে চলেছে; তার সঙ্গীনীর চটিটা অন্ততঃ দুসাইজ ছোট, পায়ের আধখানা বেরিয়ে আছে চটি ভেদ করে, সেই মেয়েটিও মরণপন করে খুঁড়িয়ে চলেছে বেশভুসার মান রাখতে। আর এক জায়গায় দেখি গোটা

পরিবার (যার মধ্যে একটি প্র্যামে চড়া দুগ্ধপোষ্যও আছে) দিব্যি কিমোনো সাজে চড়ে বেড়াচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে কখন গিয়ন এলাকায় এসে গেছি, এখানে সত্যিকারের গেইশাদের বাস; তবে রাস্তায় অফুরন্ত কিমোনোধারীর ভীড়ে তারা বোধহয় ঘরেই মুখ লুকিয়েছিল। দেখতে দেখতে বড় রাস্তায় এসে পড়েছি, দেখি একটা ট্যাক্সির সামনে গোলমাল। জাপানীরা শান্তিপ্রিয় সভ্য জাতি, যন্ত্রের মত কাজ করে, তাই কৌতুহলী হয়ে কাছে গেলাম ব্যাপার কি দেখতে। ট্যাক্সির ড্রাইভার বারেবারে অটোমেটিক দরজা বন্ধ করছে, আর দরজা ছিটকে খুলে যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার নামানোর পরে এই বিপত্তিতে লোকটি নাজেহাল; এদিকে প্যাসেঞ্জার যুগলের পুরুষটি হাত পা নেড়ে কিছু বোঝাতে চেয়ে পারছে না। লক্ষ্য করে দেখলাম, তার কিমোনোর খুঁট আটকে গেছে দরজার কোনায়, তাতেই দরজা খুলে যাচ্ছে, ড্রাইভার সাহেব তার আয়নায় তা দেখতে পাচ্ছেনা। শেষে আমরা ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বোঝালাম কোনওমতে, প্যাসেঞ্জারটিও এরপর শান্তিতে জট ছাড়ালো কিমোনোর। এবার আমাদেরও ফিরতে হবে, সামনেই বাস স্টপ; সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল রাস্তার দুধারে অসংখ্য কিমোনো ভাড়া দেওয়ার দোকান, মাত্র পাঁচশ ইয়েনে (ভারতীয় টাকায় আন্দাজ চারশ) সারাদিনের জন্য আর সেই সাথে কিছু অতিরিক্ত পয়সায় গেইশা মেকআপ। জানলার ভেতরে তাকিয়ে দেখি সারি সারি মেয়ে বসে আছে কাঠের পুতুল সেজে, আর দ্রুত হাতে চলছে চুনকাম আর চুলের সাজ। আমি জুলু জুলু চোখে তাকিয়ে আছি দেখে কর্তা হন্তদন্ত হয়ে বাস ধরতে ছুটলেন, তিনি বোধহয় আমার মতগতির ওপর আর ভরসা রাখতে পারছিলেন না।

হরিণে হরিল হৃদি

আমাদের সাম্প্রতিক জাপান সফরে, কর্তা ও আমি কিয়োটো শহরে ছিলাম দিন চারেক. তার মধ্যে একদিন ঠিক হল কাছের এক ঐতিহাসিক শহর নারা তে যাবো। সেইমত বেরোলাম সকাল সকাল, ট্রেনে ঘন্টা খানেকের মামলা; লোকাল ট্রেন, তবে জাপানি তো, তাই সেও আমাদের শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতই তকতকে। নারা স্টেশনে পৌঁছে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম নারা পার্ক কতদূর, সে লোকটি তার ভাঙাচোরা ইংরেজীতে বোঝালো মাত্র মিনিট কুড়ির হাঁটা পথ; আমার যা ফিটনেস তাতে নিজের পায়ের ওপর ভরসা না করে ট্যাক্সিতেই চেপে বসলাম শেষমেশ। রাস্তার দুধারে বসন্তের সমারোহ দেখতে দেখতে পার্কের কাছাকাছি এসে গেছি, চোখে পড়ল রাস্তায়, ফুটপাথে গাদা গাদা ছাগলের পাল। জাপান যে আমাদের দেশকেও মাত দেবে ছাগলামিতে! কেমন ভড়কে গেলাম। ভাড়া মিটিয়ে রাস্তায় নেমে বুঝলাম, ছাগল নয়, এরা সব হরিণ। এমন পালে পালে দেখে ছাগল ভেবে ফেলেছিলাম আর কি। তা লোকজন দেখে মোটেও ভয় পায়না তারা, দিব্যি এগিয়ে এসে হাত থেকে খাবার খায়; তাদের খাওয়ানোর জন্যে খাবার কিনতে পাওয়া যাচ্ছে অনেকগুলো ঠেলাগাড়িতে। বুঝলাম, হরিণ ও এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি, ট্যুরিস্টদের খাওয়ানোর হিড়িকে পাশের জংগলের যাবতীয় চারপেয়ে পার্কে এসে জুটেছে, মাঠ ভর্তি ঘাসে তাদের কোনো আগ্রহ নেই; বিনা পরিশ্রমে খেতে পেলে আবার চরে খাওয়া কেন!

নারা পার্কের পাশে বিখ্যাত টোডাই জি মন্দির, আমরা প্রথমে সেখানে গেলাম, নবম শতাব্দীর অনুপম স্থাপত্য, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কাঠের ইমারত। তবে মূল সাততলা মন্দিরটি এখন আর নেই, তবু যা আছে সেও বিস্ময়কর। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকতে চড়তে হয় বেশকিছু খাড়াই সিঁড়ি, আমার মত অনেকেরই বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল সেখানে, তবে নধর চেহারার হরিণরা দেখলাম সেখানেও উপস্থিত, তাদের তো আর আমার মত হাঁটুর সমস্যা নেই!

যাহোক, ভগবান দর্শনের পরে, ছবিতোলা ও ডান্ডা বাগিয়ে সেল্ফি তোলার মত অবশ্য কর্তব্য পালন করতে করতে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছি, তাই বসলাম গিয়ে মন্দিরের দালানে। সেখানে বসে আছি, হঠাৎ কর্তা ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন, 'এই ব্যাটা আমার জ্যাকেট চিবোচ্ছিল', একটা গোদা হরিণকে দেখিয়ে বলে উঠলেন তিনি। সেই গোদা এখানে সুবিধে করতে না পেরে এগোল কাছেই বসা এক মধ্য বয়সী শ্বেতাঙ্গীনীর দিকে। তাঁর কাছে একটা খাবার প্যাকেট ছিল, ভাবলাম বুঝি সেটাই লক্ষ্যবস্তু। ও হরি, প্যাকেট নয়,

মহিলার শার্টটাই বাবাজীর বেশী মনে ধরেছে, শেষকালে সঙ্গের খাবার ঘুষ দিয়ে মহিলা কোনক্রমে বস্ত্রহরণ ঠেকালেন।

এ আবার কেমনতর ব্যাবহার? ভাল ভাল খাবার খেয়ে কি অগ্নিমান্দ্য ঘটেছে, তাই জামাকাপড় চিবিয়ে মুখশুধ্যি করা? ছোটবেলায়, আমাদের পাড়াতে একটা গরু চরে বেড়াতো, সে চটি, গামছা এমনকি সাবান পর্যন্ত চেবাতো মনের সুখে, কি জানি এও সেরকম কিনা!

তবে হরিণের ব্যাদরামোর এখানেই শেষ নয়, পার্কের মাঝখানে ছাউনি ঘেরা বসার জায়গায় বসে আছে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট, আমরাও দুজন দুটো আইসক্রিম কিনে সদ্য এককোনে বসেছি। হঠাৎ একটা গোদা শিং বাগিয়ে তেড়ে গেলো উল্টো দিকে বসা দুই থাই তরুণীর দিকে। তারা সঙ্গের যাবতীয় খাবার, মায় জলের বোতল মাটিতে ফেলেও উদ্ধার পায়না, একগুঁয়ে ষাঁড়ের মত ব্যাটা লেগে রইল ওদের সাথে। ওরা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে পালিয়ে বাঁচল শেষে। এবার মহাশয় মনযোগী হলেন আমাদের প্রতি। কর্তা বুদ্ধি দিলেন, ওর দিকে তাকিও না, পাত্তা না পেলে চলে যাবে। একটু পরে তিনি নিজেই তিন লাফে বেঞ্চি ছেড়ে ছাউনির বাইরে, উপদেশ কাজে লাগেনি, হরিণ ওঁর জামার নীচে থেকে বেরিয়ে থাকা গেঞ্জি ধরে টেনেছিল। এবার সে তেড়ে এলো আমার দিকে; না জামা নয়, আমার হাতের আইস্ক্রীমটাই লক্ষ্যবস্তু। এদিকে আমি জুতো খুলে বেঞ্চিতে বসা, দৌড়ে পালাতে গেলে দামী জুতোজোড়ার মায়া ছাড়তে হয়, সদ্যকেনা চামড়ার জুতো চিবিয়ে চুয়িংগাম করে দেয় যদি! ফলে আমি আইসক্রীম সমেত হাত উর্দ্ধে তুলে নিমাইয়ের পোজে হাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছি, আমার এই কাছা খোলা দশায় ব্যাটার উৎসাহ তুঙ্গে। এসময় আমার উদ্ধারে নামল একটু দূরে বসা একটি চীনে ছেলে, প্রথমে সে একটা হাজার ইয়েনের নোট বের করল, মন্ত্রের মত কাজ হল তাতে, হরিণ ধেয়ে গেল তার দিকে অসীম আগ্রহে। সে হাঁ করে যেই নোট চেবাতে চেষ্টা করছে, ছেলেটি নোট পকেটে পুরেছে; আর যায় কোথায়, হরিণের নজর পকেটে। এরমধ্যে তার আরও দুটো সাথী সঙ্গ দিতে হাজির, আমার উদ্ধারে নেমে, ছেলেটি তখন কোনঠাসা। কিন্তু, এবার ছেলেটি যা করল, তাতে আরও একবার প্রমাণ হল চীনেরা সত্যিই অদম্য। ছেলেটি বাঘের আওয়াজে ডেকে উঠল কয়েকবার, কয়েক সেকেন্ডেই ছাউনি হরিণমুক্ত। এরপর আমরা মহা আরামে আইসক্রীম শেষ করলাম; জুতোটা অবশ্য পায়ে গলিয়ে নিয়েছিলাম... বলা তো যায় না!

সেদিন দুজনে

বেশ কয়েক বছর আগের কথা, তখন সবে কলেজে ঢুকেছি, বি-কম ফার্স্ট ইয়ার। নামী কলেজ, ক্লাসে ডজন তিনেক ছেলের মধ্যে মেয়ে মোটে আমরা সাতজন; তাই অনেকটা সাতভাই চম্পা স্টাইলে ওঠা বসা এবং আড্ডা দলবেঁধেই চলে। সেদিন বাসস্ট্যান্ডে ছুটির পরে জটলা করছি সবাই মিলে, মনোজ্ঞ আলোচনায় উত্তেজনা তুঙ্গে। একসপ্তাহ হল এক নতুন ইকনমিক্স প্রফেসর এসেছেন কলেজে; সদ্য পাশ করা যুবক, জিন্স-টিশার্ট আর রকস্টার স্টাইল চুলে একেবারে হিরো। আলোচনা তাঁকে ঘিরেই, বলা বাহুল্য। 'বিয়ে হয়েছে? বাড়ী কোথায় রে? টিউশন পড়াবে আমাদের?' এহেন বিতর্কে গলা ফাটাচ্ছি কয়জনে। খানিক পরে দুজনের রুটের বাস এসে পড়াতে আলোচনায় ভাঁটা পড়ল তখনকার মত; আমিও ব্যাগ হাতড়ে খুচরো পয়সা দেখে নিতে থাকি আমার বাসের অপেক্ষায়, আজ বাড়ীতে সদ্য বিবাহিত ছোট পিসি-পিসেমশায় এসেছেন, রাতে হেভি খাওয়া দাওয়া, মনটা তাই চঞ্চল।

'সন্দীপা!' হঠাৎ পেছন থেকে নিজের নাম শুনে ফিরে তাকিয়ে বেশ একটা চমক লাগলো। 'আমি নিলয়, তোমার সেকশনেই পড়ি' আমার দিকে এগিয়ে আসা ছেলেটির পরিচয়ের দরকার ছিলনা, ক্লাসের সবচেয়ে হ্যান্ডসাম ছেলে হিসেবে ওকে বাকি মেয়েদের মত আমিও চিনে রেখেছি প্রথম দিন থেকেই।

'বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছ?' হেসে সায় দিলাম, মনে মনে বললাম, 'বাসস্ট্যান্ডে আর কিসের জন্যে দাঁড়াবো!' নিলয় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে, আমি হুঁ-হ্যাঁ করে উত্তর দিচ্ছি, ভেতরে যাই হোক বাইরে বেশ একটা অন্যমনস্ক ভাব ধরে রেখেছি। এরমধ্যেই কয়েকজন সহপাঠিনী আমাদের লক্ষ্য করেছে, তাদের চোখে ঈর্ষার রেশ দেখে আমার মন ফুরফুরে।

একটু পরে যথারীতি আমার বাস এসে পড়ল; এগোতে যাব, 'এটা বড্ড ভীড়, পরেরটায় যেও' নিলয় বাধা দিল। তারপর আধঘন্টা ধরে যত বাস এলো, নিলয়ের হিসেবে সবগুলোই খুব ভীড়; অগত্যা! এই মনোযোগ ভালো যতই লাগুক, সন্ধ্যে হয়ে আসছে তাই আমি উশখুশ করতে থাকি।

'আমাদের তো একই রুট, চলো তোমাকে স্টপে নামিয়ে দেবো' ব্যাপার বুঝে প্রস্তাব দেয় নিলয়। আমাদের রুট এক হলেও আমার বাড়ী ওর স্টপেজ ছাড়িয়ে আরও অনেকটা, ওর উৎসাহে মনে মনে হেসে রাজী হলাম। ততক্ষণে আমাদের গন্তব্যের একটা বাস এসে পড়েছে, বেশ ফাঁকা । নিলয় বীরত্ব দেখিয়ে একলাফে বাসে উঠে দখল নিলো জানলার ধার ঘেঁষে দুটো সিটের, আমি শেষবারের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে

দাঁড়িয়ে থাকা বান্ধবীদের দিকে তেরছা দৃষ্টি হেনে এগোলাম প্রায় সেলিব্রিটি স্টাইলে। বাসের পাদানিতে সবে বাঁ-পাটা রেখেছি, এমন কপাল, ডান পায়ের চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেলো পটাং করে; বাসটা গোঁত্তা খেয়ে স্টার্ট নিলো ঠিক সেই মুহূর্তেই।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ডান-পায়ের বুড়োআঙুল থেকে ঝুলন্ত চটিটা স্যাট করে ঝেড়ে ফেলে উঠে আসতে যাচ্ছি, কন্ডাক্টর চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, চটি পড়ে গেল যে!' না শোনার ভান করে লাভ হলনা, কন্ডাক্টর আমার উপকার করতে ততক্ষণে মরিয়া; বাস থামিয়ে ছেঁড়া চটি রাস্তা থেকে তুলে নিতে বাধ্য করল। কি করি, এক হাত, আর এক পায়ে চটি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিলয়ের পাশে গিয়ে বসলাম। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছি না, দুজনেই চুপচাপ। যাইহোক, এভাবে কিছুটা যাবার পরে নিলয়ই অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে হাসি হাসি মুখ করে পড়াশোনার কথা তুললো একসময়; জানলার মিষ্টি হাওয়া, আর পাশাপাশি আমরা দুজন, ভাললাগাটা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

'কি হল, লেডিস সীটটা ছাড়ুন!' একজন কানের কাছে হেঁকে উঠল নিলয়কে লক্ষ্য করে।

'ভাইটি বোধ হয় ঠিক সিওর নয়!' আর একজন ফোঁড়ন কাটল পাশ থেকে (সুন্দরী মহিলার সঙ্গী পুরুষকে হ্যাটা করার সুযোগ পেলে কেই বা ছাড়ে!)।

চমকে সীটের ওপরে তাকিয়ে দেখি 'মহিলাদের জন্যে' লেখা। আগ্রহের আতিশয্যে জায়গা রাখতে গিয়ে নিলয় খেয়াল করেনি নির্ঘাত। ফর্সা মুখ লাল করে ও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমারও কান গরম, কি বলব ভেবে পেলামনা।

'টিকিট!' ঠিক তখনই কন্ডাক্টর টিকিটের পয়সা চাইতে এসে অস্বস্তি থেকে বাঁচালো, মনে মনে লোকটাকে আগের অপরাধের জন্যে ক্ষমা করে দিলাম।

'আমি টিকিট কাটছি' নিলয় আগ্রহভরে দুজনের টিকিটই কাটতে চাইল, আমি হেসে পরিস্থিতি হালকা করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু একি! জিনসের এ পকেট, ও পকেট, শেষে শার্টের বুক পকেট নিলয় আকুল হয়ে হাতড়াচ্ছে; কেমন পাগল পাগল ভাব।

'কি হল পকেটে পয়সা না নিয়েই বাসে ওঠেন নাকি?' কন্ডাক্টর বিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠল। নিলয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মানিব্যাগ বেপাত্তা, বাসস্ট্যান্ডে পকেটমারি হয়েছে সন্দেহ নেই। অবস্থা সামলাতে, পয়সা বের করে আমিই দুজনের টিকিট কাটলাম; দুজনের মুখেই বর্ষার মেঘ, কথা ভাষা হারিয়েছে।

'আমি বলি কি, আর কষ্ট করবে কেন, তুমি বরং নেমে যাও; আমি একাই যেতে পারব' নিলয়ের স্টপেজ আসতে আমি চেষ্টা করে বলে উঠি। ও স্পষ্টতই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, আর কথা না বাড়িয়ে এগোল দরজার দিকে। আমিও মনে মনে বললাম, 'ভাগ্যিস চেনা কেউ ছিল না!'

আমাদের বন্ধুত্ব যে এরপর আর এগোয়নি, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আলাপচারিতা

গেলো সোমবার সকালের দিকে একটা দামী কাফেতে ঢুকেছি; এসব জায়গায় যাওয়া আমার মত বেকারের কাছে বিলাসিতাই, তবে সেদিন খানিকটা দায়ে পড়েই গিয়েছি সেখানে। একটা চাকরীর উমেদারিতে দেখা করার ছিল এক কর্তাব্যক্তির সাথে, জ্যামের আশঙ্কায় আর অতি উৎসাহে পৌঁছে গেছি সময়ের ঢের আগেই; চাচা আমার স্বভাব জানেন, তাই বারবার বলে দিয়েছিলেন বেশী আগে গিয়ে ওনার অফিসে যেন হত্যে না দি, যোগাযোগটা চাচাই করিয়ে দিয়েছিলেন কি না! তা কি করি, ওখানে আশেপাশে খানিক্ষন সময় কাটানোর জন্যে ওই কাফে ছাড়া আর গতি নেই। অগত্যা, বিরিয়ানির চেয়ে বেশী দাম দিয়ে এককাপ কফি কিনে কোণার দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম আয়েশ করে। বসে চারপাশটা জরিপ করছি, এসির ঠান্ডায় মনটা বেশ চনমনে লাগতে শুরু করেছে, পয়সা নষ্টের ক্ষোভটাও মোলায়েম হয়ে আসছে তার সাথে। এমন সময় পাশের টেবিলের দুই মাঝবয়সী মহিলাকে দেখে বেশ আগ্রহ বোধ করলাম, মানে ঠিক দেখে নয় ওঁদের আলাপচারিতা শুনে।

'বুঝলেন, আমাদের কাজের বুয়ার ভাইয়ের ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে; সেই নিয়ে বাসায় একেবারে হুলুস্থুল', বেশ দাপুটে চেহারার একজন মহিলা তাঁর উল্টোদিকে বসা ছোটখাটো সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন।

'সেকি বুয়ার ভাইয়ের ছেলের কারণে আপনার বাড়ীতে হুলুস্থুল?' অন্যজন বিস্ময় চেপে রাখতে পারেননা।

'হবে না? বুয়া তো ফোনে খবরটা শুনেই দেশে দৌড় দিলো, তো আমার বাড়ীতে হুলুস্থুল হবেনা?' সামনের প্লেটে রাখা ফ্রাইড চিকেনের ঠ্যাঙে কামড় বসাতে বসাতে জানান দেন মহিলা। অতঃপর সঙ্গিনীর মুখ সমবেদনায় কাঁচুমাচু।

'এর মধ্যে আবার মামীর ভাই আসছেন লন্ডন থেকে, বুঝুন অবস্থা'।

'ওহো, কাজের বুয়া না থাকলে বাড়ীতে মেহমান এলে তো খুবই মুশকিল', উল্টোদিকের মহিলা মিয়োনো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নাড়াচাড়া করতে করতে বান্ধবী সমস্যায় মুষড়ে পড়েন।

'আরে না না, আমার বাসায় নয়, মেহমান তো কুমিল্যায় মেজোমামার বাসায় আসছেন; আমাকে অতদূরে আবার দেখা করতে যেতে হবে না? সেটাই তো মুশকিল'। সম্ভবত সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতেই বার্গারে একটা বড় কামড় বসান তিনি।

‘তার মধ্যে পরশু বাথ্রুমে পড়ে গিয়ে গোড়ালি মচকে সে এক কান্ড; ডাক্তার বলেছে একসপ্তাহ বেডরেস্ট, না হলে নাকি পায়ের গোলমাল হতে পারে’।

‘ওমা, তাই নিয়ে আপনি আবার চলাফেরা করছেন?’ সাথের মহিলা আঁতকে উঠে ঝুঁকে পা দেখতে যান।

‘ধ্যেৎ, আমার পা দেখেন কেন, গোড়ালি তো আমার শাশুড়ির মোচকেছে’। ধ্যাঁতানি খেয়ে সঙ্গিনীর মুখ আঁধার, প্লেটের কোণায় রাখা অবহেলিত কাটা শসার মতই।

‘এদিকে গরমটা যা পড়েছে, এসি ছাড়া এক মিনিটও থাকার উপায় নেই, বেডরুমের মেশিনটা বিগড়োনোর আর সময় পেলনা! বাপের বাড়ীর বুঝলেন না? আমাকেই তো সব খেয়াল রাখতে হয়!’ দয়া করে নিজেই এবারেরটা খোলসা করলেন মহিলা কোল্ড কফিতে লম্বা চুমুক দিতে দিতে।

‘সকাল থেকে গলাটা কেমন ব্যাথা ব্যাথা করছে, কথা বলতেও কষ্ট, নতুন করে ডাক্তার বদ্যি করতে ভাল্লাগে না আর!’

‘কার গলায় ব্যাথা?’ সঙ্গের মহিলাটি এবার সাবধানী গলায় জানতে চান। ‘কার আবার, আমার! গলা শুনে বুঝছেন না কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?’ রীতিমত হুঙ্কার ছাড়েন দাপুটে মহিলা সালাডের প্লেট দূরে ঠেলে দিতে দিতে।

‘গলাকে একটু বিশ্রাম দিন, ঠিক হয়ে যাবে’ স্পিনিঙের কায়দায় পাশ থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আর বসে থাকতে ভরসা হয় না; তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোই আমি।

স্পর্শকাতর ফোন

আজকালকার টাচ ফোন বড় স্পর্শকাতর, কিছুদিন আগে এরকম একটা ফোন কিনে অবধি আমিই কাতরাচ্ছি সমানে। এমনিতেই ইংরেজী শব্দে বাংলা লেখার চাপ, বাংলা টাইপে লেখা কিছুতেই রপ্ত করতে পারিনি আমি এখনও, তার ওপর সব সাংকেতিক শব্দ, 'লল', ওএমজি'; তাতেও শান্তি নেই সঙ্গে আছে হরেক ইমোজি। এতকিছু শিখতেই যদি পারব, ক্লাস নাইনে দুবার গড়িয়ে, বিকম এ অনার্স খুইয়ে মা সরস্বতীর চৌকাঠ পেরোই?
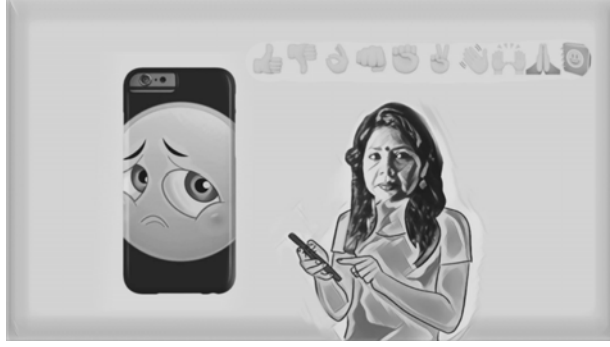
সে যাই হোক, কয়েকমাস আগের কথা, আমার মাসতুতো বোন জয়ার বিয়ের সব ঠিকঠাক; হবু বরের সাথে আলাপ করিয়ে দিলো ও একদিন। সেই সূত্রে ফেসবুকে আমরা ফ্রেন্ড হলাম। বিয়ের দিন প্রায় এসে গেছে, হবু জামাইবাবু ফেসবুকে নিজের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িসমেত ও দাড়ি ছাড়া দুটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপসান দিলেন, 'ক্লিন শেভ বেটার? বন্ধুরা কি বল?' আমি মহাউৎসাহে তড়িঘড়ি কমেন্ট দিলাম, 'একেবারে লালটু'। তবে আজকালকার টাচ ফোন তো, তাড়াতাড়ি টাইপ করতে গিয়ে ইংরেজি অক্ষরে 'এল' এর জায়গায় 'এফ' লেখা হয়ে গেলো, মানে 'একেবারে ফালতু'। এমন কপাল আমি সেটা খেয়ালও করিনি, তবে জামাইবাবু ঠিকই খেয়াল করেছিল; ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আনফ্রেন্ড হলাম। স্বাভাবিক ভাবেই, জয়ার বিয়ের নিমন্ত্রনে আমার মজাটা কেমন পানসে হয়ে গেছিল এরপর।

আরও কিছুদিন পরের কথা, সদ্য ম্যাসেঞ্জারে চ্যাট করতে শিখেছি। অটোতে যাচ্ছি একটা চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে, ম্যাসেঞ্জারে দেখা দিলেন আমার বর্তমান অফিসের এক সহকর্মীনি; তিনি আমার সিনিয়ার, খাতির করে দিদি দিদি বলি; খাতিরের আসল কারণটা হল তিনি বসের ডানহাত। অফিসে মিথ্যে বলে বেরিয়েছি, অন্য চাকরীর চেষ্টা করছি একথা কেই বা অফিসে জানায়! তাই একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'তুমি কোথায়?' সিনিয়ার প্রশ্ন করছেন।

'ডাক্তারের চেম্বারে!' আমি সাবধানে উত্তর দিই।

'অফিসে এমারজেন্সী'।

'কি হয়েছে?' আমার ততক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ।

'বসের হার্ট অ্যাটাক, অবস্থা খারাপ' দিদি খোলসা করলেন। সেই মুহূর্তেই গর্তে চাকা পড়ে অটোতে প্রচন্ড ঝাঁকুনি; আর আমার হাত লেগে ম্যাসেঞ্জারে থাম্স আপ স্টিকার পোস্ট হয়ে গেলো। এরপর ইন্টারভিউ মাথায় উঠলো, আমি যে বসের অসুখে উল্লাসিত নই, বরং দুঃখ পেয়েছি খুব, সেটা বোঝানোর

আপ্রাণ চেষ্টায় লেগে রইলাম মোবাইলে। সেদিনের চাকরীটা আমি পাইনি, উপরন্তু, অফিসের সেই দিদিও কেমন এড়িয়ে চলতে শুরু করল আমায় এরপর থেকে।

ফোন কোম্পানীদের পাঠাব বলে একটা আর্জি লিখিয়েছি পাড়ার বুনো কাকাকে দিয়ে, ইংরেজীতে মনের কথা খোলসা করতে পরের সাহায্য নিতেই হল! বুনো কাকাও খুশী হয়ে লিখে দিলেন, শুনলাম কাকার একটা দামী টিউশনি চলে গেছে গতমাসে, ছাত্রের মা কে স্মাইলি পাঠাতে গিয়ে, হার্ট পাঠিয়েছিলেন কিনা! তা যাইহোক, আর্জি জানিয়েছি বোতাম ফোন ফেরত আনার জন্য, আমি অস্পৃশ্য ফোনে বিশ্বাসী; ভরসা আছে তাতে অনেকেরই সই জোগাড় করতে পারব।

দাদাগিরি

এমনিতেই আমার মাথাগরম বলে বদনাম, তার ওপর রীতিমত চর্চা করা তাগড়া চেহারা; লোকে আমায় বিশেষ ঘাঁটায় না। পাড়ার ভালো মন্দের দায়, ছেলে ছোকরাদের ওপর নজরদারি, সে একরকম আমি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করি; তাতে মাঝে মধ্যে একে ওকে একটু কড়কাতে হলে কি বা এসে যায়! তবে আজ সকাল থেকেই বিলের কাণ্ড দেখে মেজাজ আমার সপ্তমে, এর একটা শেষ না দেখে আমি আর ছাড়ছি না। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘোষ বাড়ীতে ওর চুপি চুপি যাতায়াত আমি লক্ষ করেছি, মিয়াঁ বিবি যখন কাজে যায় তখনই বেটা উঁকি ঝুঁকি মারে খিড়কির দরজা, নয় রান্নাঘরের জানলা দিয়ে। কার সায়ে এসব চলছে তাও বুঝি; গেলো মাসে ভালবেসে ও বাড়ির মিনিকে একটা ফিস ফ্রাই খাওয়াতে চেয়েছিলাম। তা দোকান থেকে বাগিয়ে আনতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল আরকি, অমনি মুখ ঝামটে বলল 'বাসি খাবার আমি খাই না!' আর এই ছিঁচকে বিলে, তার ওপর কি দরদ!

আজ তিতলিদির জন্মদিন, ঘোষ বাড়িতে হেভি খাওয়া দাওয়া, পাড়াসুদ্ধু লোকের নেমন্তন্ন; আমিও যাবো, তবে একেবারে শেষের দিকে, নেমন্তন্নের ধার আমি ধারি না। তাই তো বিলেটাকে সন্দেহ, আমি তো জানি ব্যাটা চুরি বিদ্যেয় এরই মধ্যে হাত পাকিয়েছে, নির্ঘাত লোকের ভিড়ে হাতসাফাইয়ের তালে আছে। আর চুরির দোসর যখন ঘরেই মজুত তখন আর পায় কে! কিন্তু আমি থাকতে সেটি হতে দিচ্ছিনা, তক্কে তক্কে আছি, আজ হাতে নাতে ধরে ওকে পাড়া ছাড়া করে তবে আমার শান্তি।

বাড়ির ভেতর থেকে মাছের কালিয়া আর ভেটকির পাতুরির গন্ধে রাগটা প্রায় গলে যাবার জোগাড়, কিন্তু না, কর্তব্যে অবহেলা এ শর্মা করে না, তাই না পাড়ায় আমার এতো খাতির! যাইহোক, দিপুদের পাঁচিলের আড় থেকে আমি ঠিকই নজর রাখছি হতচ্ছাড়া বিলের ওপর। লোকজন বেশ কিছু আসতে শুরু করেছে, মিনি ঢঙ করে তিতলিদির সাথে সাথে ঘুরছে, যেন জন্মদিনটা আজ ওরই! খাওয়ার আসরে হাঁকডাক বাড়ছে, ঠাকুর সামাল দিতে নিজেই পরিবেশনে হাত লাগিয়েছে; এই মওকায় বিলে একলাফে বাড়ির ভেতর, আর যায় কোথায় আমিও মারলাম এক লাফ, একেবারে বিলের ঘাড়ে। দুজনে গড়াতে গড়াতে রান্নাঘরের দরজায়, গায়ের জোরে ব্যাটা নেহাত কম যায় না, সঙ্গে তেমনি গলার জোর, জাপটাজাপটি, গর্জন; আজ কেউ একপা পিছব না, যা থাকে কপালে।

‘আ মল যা, এদুটো আবার ঠিক জুটেছে! মাছের গন্ধ পেয়েছে কি হতচ্ছাড়াদের দৌরাত্ব শুরু। ফেলে দিয়ে আয় তো ন্যাপা দুটোর ঘেঁটি ধরে!’

ন্যাপার ঠাকুমার খোনা গলার চিৎকার কানে যেতে না যেতেই ‘ঝপাস!’ কে যেন খামচে নিয়ে চুবিয়ে দিলো ড্রেনের জলে। অপমানে চোখে জল এলো, এই দুনিয়ায় ভালো করতে নেই কারো। এতো যে নিঃস্বার্থে পাড়ার দেখাশুনো করি, নাহয় দু চারটে মাছের টুকরো তার বদলে খাজনা ভেবেই নিই, তাইবলে ছিঁচকে বিলে আর আমি এক হলাম!

এর থেকে তো মাছ খাওয়া ছেড়ে দেওয়াই ভালো... নাহ্ সেটা বোধহয় পারা যাবে না!

বারবেলায়

বাসটা হেলে দুলে চলেছে নিজের খেয়ালে, অনেকটা রাস্তায় চড়ে বেড়ানো গরুর মত, কোথাও পৌছনোর তাড়া নেই; মাঝে মাঝে গোঁত্তা খেয়ে থেমে যাচ্ছে যেখানে সেখানে, রাস্তার পাশের ফুলগাছের চারা বা পড়ে থাকা তরকারির খোসা দেখে গোরু থমকে যায় যেমন করে তেমনি। গরমের দুপুর, বাসের সাথে সাথে যাত্রীরাও যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে, যারা বসার জায়গা পেয়েছে বেশ একটা ভাতঘুম দিয়ে নিচ্ছে এই সুযোগে। শুধু দরজার পাশে লেডিস সীটে বসা মহিলাদের চোখেমুখেই বিরক্তি স্পষ্ট বাসের এই বেয়াদপিতে; যদিও মাঝরাস্তায় হাত দেখিয়ে তেড়ে আসা ম্যাডামদের উদ্ধারেই এই হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাওয়া। লেডিস সীটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দুটি মহিলা; তাদের একজন বছর পঁয়ত্রিশের এক জবরদস্ত মা, সীটে বসা লিকপিকে বাচ্চার ঘেঁটি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, অন্যজন হলুদ কুর্তি পরা একটি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে। মেয়েটির পাশে অখণ্ড মনোযোগে নিজেকে ব্যালান্স করতে করতে দাঁড়িয়ে আছে অল্প বয়সী, মিষ্টি চেহারার একটি ছেলে, তার গা বাঁচানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও মেয়েটির ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। এই বয়সের অন্য কোনও ছেলে হয়তো পাত্তা দিতনা এই নীরব দাবড়ানি, কিন্তু এই ছেলেটি সে ধাতের নয়। সদ্য এম-বি-এ পাশ করে ভালো চাকরি পাওয়া অনীশ বরাবরই সিরিয়াস ও স্পর্শকাতর। মৌলালীর কাছে একটা ক্লিনিকে চলেছে আজ সে; না অসুখ বিসুখ কিছু নয়, চাকরীতে জয়েনিংয়ের শর্ত হিসেবে এই নিয়ম মাফিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় যেই ছাড়িয়েছে, হঠাতই তাড়া খাওয়া জন্তুর মত দৌড়তে শুরু করল বাসটা; পেছনে একই রুটের দোসর এসে পড়েছে যে! যাত্রী ওঠানোর প্রতিযোগিতায় দুটো বাসই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। এই টালমাটাল পরিস্থিতে অনীশের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন, মাথার ওপর রড ধরে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুলতে দুলতে আড়চোখে পাশের যাত্রিণীকে একেকবার দেখে নিচ্ছে সে, সহযাত্রিনীর চোখেমুখে নির্দয় নির্লিপ্ততা। এভাবে চলছিল যাহোক, তাতেও রক্ষে নেই; এক সময় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা পেছনের প্রতিদ্বন্দীর ওভারটেক আটকাতে চাইল, আর সেইসঙ্গে হলুদকুর্তী অনীশের বুকের ওপর আছড়ে পরল 'বিরহিণী রাধা' স্টাইলে; আচমকা শকে রড ছেড়ে অনীশও দুহাতে খামচে ধরেছে তার কাঁধ, একেবারে উত্তম সুচিত্রার ফিল্মের ক্লাইম্যাক্স। বাস্তবের ক্লাইম্যাক্সটা আবশ্য একটু অন্যরকমই হোল; নিজেকে

এক ঝটকায় ছাড়িয়ে সপাটে একটা চড় কশাল মেয়েটি অনীশের গালে, আর সেই সাথে শুরু হয়ে গেলো সীটে বসা সমব্যথিনীদের হুল ফোঁটানো মন্তব্য।

'আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি, ছোঁড়াটার নজর খারাপ'।

'আরে এত জায়গা থাকতে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেন বোঝেননা?'

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে, অপমানে দুই কানে আগুনের হল্কা; দিশেহারা অনীশ কি করবে ভেবে না পেয়ে বাসের গতি একটু কমতেই একলাফে নেমে যায় মাঝরাস্তায়।

গরমের দুপুরে শুনশান রাস্তা, উটকো নেমে পড়ে হয়রানিই হবে; তবু মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনীশ, এই মুহূর্তে লোকজনের মুখ দেখতে ইচ্ছে করেনা তার। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে ঠাওর করতে চেষ্টা করে ঠিক কোথায় নেমে পড়েছে, জায়গাটা আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছাকাছি কোথাও বলেই বোধ হয়। আরে একি! বাসটা খানিকদুর গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো না? মরেছে, হলুদ কুর্তি ঝাঁপ মেরে নেমে এদিকেই ছুটে আসছে তো! হাত নেড়ে প্রচন্ড উত্তেজনায় গর্জন করতে করতে তেড়েই আসছে বলা যায়।

কোনও দিকে না তাকিয়ে সামনের গলিটাতে দৌড়ে ঢুকে পড়ে অনীশ, তার ঘোলাটে হয়ে আসা বুদ্ধিতে পালানোই উচিৎ কাজ বলে মনে হয় সেই মুহূর্তে। কিন্তু মেয়েটাও ধাওয়া করে গলিতে ঢুকে পড়ল যে! তবে কি কোনও ব্ল্যাকমেল চক্রের পাল্লায় পড়ল শেষে? আজকাল তো এরকম প্রায়ই শোনা যায়, মেয়েটার দলের লোকেরা কাছেই আছে নিশ্চই। পুলিস এমারজেন্সিতে ফোন করবে? একবার মনে হয়; কিন্তু বাসের গোলমালটাতে মহিলারা সব মেয়েটাকেই সাপোর্ট করছিল, শেষে অনীশেকেই না দোষী ঠাওড়ায়। আর কিছু ভাবতে পারেনা সে, সোজা দৌড়োতে থাকে পুরোনো কোলকাতার চোরাগলির আঁকেবাঁকে। ভরসা একটাই, অনীশের লম্বা পায়ের গতির সাথে মেয়েটা এঁটে উঠতে না পেরে, হাল ছেড়ে দেবে একসময়। কিন্তু পেছনে পায়ের আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে, মেয়েটা আশ্চর্য রকম অ্যাথলেটিক; পড়ুয়া ভালোছেলে অনীশের থেকে তার দম ঢের বেশী সেটা প্রমাণ হতে দেরী হয়না। সামনে একটা সরু গলি দেখে স্যাট করে সেঁধিয়ে যায় অনীশ রাস্তার বাঁক পেরিয়ে, মেয়েটা বাঁকের মুখে এসে খুঁজে না পেয়ে এগিয়ে যায়। এমন গোঁয়ার মেয়ে জীবনে দেখেনি অনীশ, বাগে পেলে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেবে সন্দেহ নেই।

কাঁহাতক কানাগলিতে আটকে থাকা যায়, বেরোতে তো হবেই, একটু পরে সে চেষ্টাতেই গলির মুখটা আর একবার দেখে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে অনীশ। বাঁকের মুখে পৌঁছতেই আর একটা গলি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে মেয়েটি। শুরু হয় আবার চোর পুলিশের খেলা। আবার এ গলি, সে গলি দৌড়নো, জীবনে শেষ কবে এত দৌড়েছে মনে পড়েনা অনীশের, অন্ততঃ ফুলপ্যান্ট বয়সে তো নয়ই; পা ধরে আসছে ক্রমশঃ, নিঃশ্বাস ভারী, বড্ড তেষ্টা। পেছনে ফেউ লেগেই আছে ক্লান্তিহীন পায়ে, কেমন অসহায় লাগে, শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত; দিনেদুপুরে, শহরের মাঝখানে এতরকম বিপদ জানা ছিল কি আগে!

'কিব্যাপার, মেয়েটা তখন থেকে থামতে বলছে শুনতে পাচ্ছ না?' ঘাড় ছাঁটা চুল, মোটা গোঁফ আর কুতকুতে চোখের এক ষণ্ডা চেহারার যুবক রাগ রাগ মুখ করে পথ আটকায় অনীশের।

'না মানে...আমাকে না বোধহয়'।

'কি তোমাকে না? ছিনতাই করে পালাচ্ছ? ব্যাটা তোমাদের চিনিনা?' বাঘের মত অনীশের কলার চেপে ধরে পরোপকারী যমদূত। ততক্ষণে একটা ছোটখাটো ভীড় জমে গেছে দুজনকে ঘিরে।

'বিশ্বাস করুন, আমি ওকে চিনিনা!'

অনীশের আর্তি মাঝ পথে থেমে যায় ষন্ডার গলাধাক্কায়; সামলাতে না পেরে মাটিতে পরে যায় সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরে। ভীড়ের জনতা উৎসুক, টানটান উত্তেজনায় পরিবেশ গম্ভীর, নায়কোচিত দাপটে এগিয়ে আসে দুর্দান্ত যুবক মুঠি পাকিয়ে অনেকটা দেবের স্টাইলেই; মাটিতে চিৎ হয়ে উদ্দত ঘুঁষির অপেক্ষায় চোখ বোজে অনীশ অসহায় আত্ম সমর্পণে। হঠাৎ কি হয়ে গেলো, নাকে নয়, বুকের ওপর কিছু একটা আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড়ের মত।

'মারবেন না প্লিজ!'

মেয়েলী চিৎকারে ধীরে ধীরে চোখ খোলে অনীশ। ঘাম আর চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে হলুদকুর্তী তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, অনেকটা সেই বাসের ভেতরের মতই।

'আমার সোনার দুল ওনার জামার বোতামে আটকে গেছিল, তাই ছুটে আসছিলাম, ওনার দোষ নেই' মেয়েটি তখনও বলে চলেছে। ষণ্ডাকে কেমন বিব্রত দেখায় এরপর, ভীড় সরাতে ব্যাস্ত হয় সে।

'আমি এনা, আপনার লাগেনি তো?' ; ঘোলাটে চোখে চেয়ে থাকে অনীশ ভ্যাবলার মত।

এলোমেলো ঝুড়ো চুলে ঘিরে থাকা মুখটা ভারি সুন্দর তো! এই প্রথম লক্ষ্য করে সে এক নতুন রোমাঞ্চে। মেয়েটির হাতের চাপে, বোতামঘরে আটকে থাকা ঝুমকো বুকে হুল ফুঁটিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দেয় ঠিক তখনি।

দশ এক্কে দশ

ইন্টারভিউ

'কি করা হয়?'

'আজ্ঞে, চাকরী; পার্মানেন্ট', কথা হচ্ছিলো সাধন বাবুর বৈঠকখানায় বসে। বেতের সোফায় মুখমুখি বসে বছর পঞ্চান্নর সাধন বাবু আর পল্টন ওরফে প্রনব চন্দ্র গুছাইত। সাধন বাবু কর্পোরেশন অফিসের কেরানী, স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। এককালে দু-দুটো আইবুড়ো বোনের বিয়ে, বুড়ো বাপ-মা এসব নিয়ে কায় ক্লেশে উদ্বাস্তু কলোনির দরমার বাড়িতে কাটিয়েছেন বহুবছর। তা সেসব পাট চুকে এখন তিনি ঝাড়া হাত পা, সরকার থেকে জমি নিজের নামে পেয়ে ছিমছাম একটা দুকামরার বাড়ী তুলেছেন তাতে। ছাদটা অবশ্য পাকা করতে পারেননি; তবে শান বাঁধানো মেঝে, বাহারি গ্রীলের বারান্দা, সব মিলিয়ে নেহাত মন্দ হয় নি ব্যাপারটা। আপাততঃ ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ আর মনার দোকানের শিঙাড়া সামনে রেখে তিনি বছর পঁচিশেকের ছেলেটিকে জরীপ করছিলেন।

কদিন আগে গিন্নি এসে আর্জি জানালেন, মেয়ে বুলার গোঁ, বাপের নয়, নিজের পছন্দে বিয়ে করবে, কথাটা শুনে প্রথমেই খুব খানিক চেঁচিয়ে, অবশেষে গৃহশান্তি রক্ষার্থে রাজি হয়েছিলেন ছেলেটির সাথে কথা বলতে, অতঃপর রবিবার বিকেলের এই সাক্ষাৎকার পর্ব। কেতা দুরস্ত শার্টপ্যান্ট, কায়দায় ছাঁটা চুল, চেহারাটা একটু পাকানো গোছের তবু একটা বেশ খেলোয়াড়ি ভাব আছে, ছেলেটাকে মোটের ওপর ভালই লেগেছে সাধনবাবুর; তার ওপর বাপ মা নেই, পণের ঝক্কি থাকবে না, সস্তায় মেয়ে পার করার মানসিক হিসেব কসতে কসতে অজান্তেই ঠোঁটের কোনে ঢেউ খেলে যায় তাঁর।

'বুলাকে চিনলে কি করে?'

'ওই, কলেজ আসতে যেতে বাসে দেখা, মানে আমারও তখন ডিউটি থাকে কিনা' পল্টনের জবাবে মাখনের মসৃণতা।

'ভালো; তা তোমার অফিসটা কোথায়? বুলার কলেজ তো হেদোয়'।

'আমার তো আউটডোর, বাইরে বাইরে কাজ, ওই পথেই যাই'।

'মাইনে কিরকম?' 'মাস গেলে পনেরো, এছাড়া কাজের চাপ বাড়লে ওভারটাইম। বছরে দুবার বোনাস, আই পি এল আর পুজোর সময়'।

'বটে! তা আই পি এল ও আজকাল বাঙ্গালীর উৎসব নাকি হে?'

'হে হে, ওসময় বড্ড খাটুনি যায় কিনা, মালিকের খুব দরাজ মন'।

সাধন বাবুর মুখে প্রসন্নতার আভাস, পল্টন দ্বিগুন উৎসাহে চালিয়ে যায়, 'এছাড়া মেডিকেল আছে, অন ডিউটি কিছু হলে পুরো খরচ মালিকের; আর ধরুন গে, যদি কাজের কারণে বাইরে যেতে হয়, পুরো মাইনেটা মাস গেলে আপনার মেয়ের হাতে পৌঁছে যাবে সময় মত, যতদিন না ফিরি'।

'তোমাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয় না কি?'

'না এখনও হয়নি, তবে যেতে হোতেও পারে, বোঝেনই তো আজকালকার চাকরী' পল্টন বিনয়ে তৈলাক্ত।

'তা ইনক্রিমেন্ট কেমন? তোমাদের প্রাইভেটে তো পে স্কেল-টেল নেই বোধহয়' সাধন বাবু তাঁর এই পরে পাওয়া মুরুব্বিয়ানা উপভোগ করছেন বোঝা যায়।

'টেন পারসেন্ট তো বাঁধা, ভালো কাজ করলে সেটা ডবলও হতে পারে; আমার গেলোবার তাই হয়েছিল' পল্টনের লাজুক জবাব।

'ভালো, খুব ভালো; শুনছ বিল্টুর মা এদিকে একবার এসো' সাধনবাবু দরাজ স্বরে হাঁক পাড়েন গিন্নিকে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুলাও এসে হাজির হয় মায়ের সাথে। তার চোরা চাহনির নীরব প্রশংসায় পল্টনের মুখ উদ্ভাসিত।

'তাহলে তো হয়েই গেলো, বুলার পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই একটা দিন ঠিক করা যাবে খন। ভালো কথা তোমার অফিসটা কোথায় যেন বলছিলে?' হবু জামাইকে দরজা অবধি এগিয়ে দিতে দিতে বলেন সাধন বাবু।

'আজ্ঞে বলিনি তো!'

'কি বলোনি?' তাঁর স্বরে বিস্ময়।

'অফিস কোথায় বলিনি তো! মানে আমাদের লাইনে বলা চলেনা বুঝলেন না?' সাধনবাবু সত্যিই বুঝতে পারেন না।

'আমাদের হল গিয়ে মোবাইল ফোনের কারবার, মানে ভিড় ভাট্টায় স্যাট করে ঝেড়ে নিয়ে কেটে পড়া। তা মালিকের নুন খেয়ে অফিসের কথা বলি কি করে বলুন!'

'বেল্লিক, ছুঁচো, জানো এটা ভদ্রলোকের বাড়ি!' প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ফেটে পড়েন সাধন বাবু।

'যাঃ কেলো, ভদ্দরলোকরাই শালা সব চেয়ে ছোটলোক, ধরা পড়লে যা ক্যালায়!' পল্টন হাঁটা দেয় হনহনিয়ে। সাধনবাবু ঘরে এসে ঢোকেন, নিজের অজান্তেই হাতটা চলে যায় পকেটে; মোবাইলটা আছে কি না দেখে নেন।

***

অন্য রাগ

কদিন ধরেই বাড়িতে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি; কোন এক ছিঁচকে চোরের প্রেমে পড়ে বোনটা একেবারে ছড়িয়ে লাট করছে।

ভাল্লাগে না আর বিল্টুর, 'মা ভাতটা বাড়লে'? বিটকেল স্বরে মায়ের ওপর ঝাল ঝেড়ে খেতে বসে সাধন বাবুর একমাত্র পুত্র বিল্টু ওরফে বলভদ্র।

রথের দিন জন্মেছিল সে, মায়ের ইচ্ছে নামে তার জের থাকে; তা জগন্নাথ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সাধনবাবুর বাবা নামটির আগেই দখল নিয়েছিলেন, অতঃপর এই জম্পেশ বলভদ্র। শোনা যায়, ছোটবেলায় অঙ্কের ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ায় স্যার তার ভদ্রতাবোধ নিয়ে বেজায় সন্দেহপ্রকাশ করেন, সেই থেকে নামের জন্যে বিস্তর খোরাক হয়েচে বিল্টু; তাই থেকেই নাকি এই বেয়াড়া রাগ তার। দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময়টাই সে রেগে থাকে, দৈনন্দিন কাজকর্ম সে রেগে রেগেই করে; বাড়ির লোক মায় পাড়ার ছেলে ছোকরারাও তাকে ঘাঁটায় না। তবে একটা ব্যাপারে বিল্টু নিজেই বেশ ঘেঁটে আছে কিছুদিন ধরে। বি-কম পাশ করে বাড়ি বসে ছিল, হাতে কাজ নেই তাই রাগ করাটাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার। শেষে মরীয়া হয়ে বড়বাড়ির রায়মশাইকে ধরে একটা কাজের ব্যাবস্থা করলেন সাধন বাবু; ছেলের মনটা একটু ঘুরবে, হাতে টাকাও আসবে যাহোক এই ভেবেছিলেন। কাজটা রায়মশাইয়ের পুত্রবধূর শাড়ির ব্যাটিকে খাতালেখার, ব্যাটিকটা খুবই নামী, মাইনে খারাপ নয়। কিন্তু গোলমালটা অন্যখানে, সারা দোকানে পুরুষ কর্মচারী বিল্টু একা বাকি সবই মেয়ে। সবই অল্পবয়সী, কেমন যেন ফিচেল টাইপ, তেমন আয়েশ করে রাগ করতে পারে না বিল্টু, আর তাতেই যেন দমবন্ধ করা দশা তার।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে অটোর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা আবার নতুন করে গরম হতে থাকে, আজ মাছের ঝোলটা একেবারে অখাদ্য ছিল, মেয়ের শোকে রান্নায় মোটে মন নেই মার। অটোর আশা ছেড়ে

একটা ভীড় বাসের পাদানিতেই ঝুলে পড়ে বিল্টু, তাতেও দোকানে পৌছতে একটু দেরীই হয়ে গেলো; কেউ বলবে না কিছু, তবে ঝুমুর নামের ওই মিচকে মেয়েটা একটা জ্বালা ধরানো ফিচেল হাসি হাসবে।

'তখন থেকে বলছি ভালো কিছু দেখাও, সেই একঘেয়ে ট্র্যাশ যত। গেলোবার কি একটা গছালে কিটি পার্টিতে আই ওয়াস জাস্ট নট গেটিং এনি আটেন্সান', সেই মোটা মহিলা অদ্ভুত সাজপোশাকে আবার দোকানে হাজির, আজ ঝুমুরের কপাল খারাপ, সকলেই টেনশনে চুপচাপ, ঝুমুর প্রাণপণ তোয়াজে ব্যস্ত।

'কি ব্যাপার, গ্রে, বেইজ এসব কি দেখাচ্ছ? আর কালো তে তো আলমারি ঠাসা; ওই লাল জারদৌসিটা দেখাও, আর অরেঞ্জটাও' মহিলা খিঁচিয়ে ওঠেন।

'ম্যাডাম লালটা ক্যারি করতে একটু অসুবিধা হতে পারে, মানে ওটা আসলে ওয়েডিং কালেকশন তো' ঝুমুর আমতা আমতা করে।

'কি বলতে চাইছ তুমি? মানে লাল শাড়ী পড়ার বয়স নেই আমার? আই ওয়ান্ট টু টক টু দ্য ম্যানেজার; যত বস্তির মেয়ে কে দোকানে জুটিয়েছে, কথা বলতে জানেনা!' বিশ্রী মুখভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠেন মহিলা।

'এই! বস্তি দেখাচ্ছেন কাকে? ভদ্দরলোক এসেছে! খুকীদের লাল শাড়ী পরার বয়স বা চেহারা কোনটাই আপনার নেই; ফুটুন তো এবার! যত্ত সব!' হঠাৎ করে তেড়ে ওঠে বিল্টু। এক পলকেই শ্মশানের নিস্তব্ধতা, অনভ্যস্ত দাবড়ানিতে থমকে যান উদ্ধত মহিলা, মুখ কালো করে বেরিয়ে যান চুপুচাপ। সকাল থেকে জমে থাকা রাগটা বের করতে পেরে বেশ ফুরফুরে লাগে বিল্টুর।

'আজ আপনি না থাকলে!' বাকীটা আর বলতে পারেনা ঝুমুর, তার ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেমন ভেঙে চুরে যায়, এই অজানা অনুভুতি আর যাই হোক রাগ নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়না বিল্টুর।

***

জিঘাংসা

ব্যুটিকের দুপয়সার ম্যানেজারটার অসভ্যতায় দিশেহারা লাগে তনিমার, অপমানে চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ে, 'গ্রে স্ট্রীট চল' ড্রাইভারকে হুকুম দিয়ে চোখ বোঁজে সে। আজকাল সব খানেতেই যেন হেরে যাচ্ছে তনিমা, পার্টিতে সৃজিতকে নিয়ে কানাঘুষো, বন্ধুমহলে অনুকম্পা, সবমিলিয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারেনা আর। 'সৃজিতকে প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যায়, যদিও তনিমার প্রতি তার আগ্রহের অভাব লুকোতে চেষ্টা করেনা; তবে এটাও ঠিক বৌকে ঝেড়ে ফেলবার মত কলজের জোরও তার নেই। চোরা পথের উঠতি পয়সা হলেও, ব্যাবসা আর সম্পত্তিতে তনিমারও সমান অংশীদারী, শুরুটা যে ওর বাবার পয়সাতেই।

চুপচাপ হেরে যাবার মেয়ে অবশ্য তনিমা নয়, সৃজিতকে জব্দ সে করবেই। খবরের কাগজ থেকেই মিঃ দে-র সাথে যোগাযোগ, প্রথম দিন গ্রে স্ট্রীটের ঘুপচি অফিসটায় যাবার অভিজ্ঞতা যে খুব ভালো হয়েছিল তা নয়। একেই ভারী শরীর নিয়ে তিনতলায় খাবি খেতে খেতে ওঠা, তায় সিরাজদৌলার আমলের একটা টেবিলের ওধারে বসা মুশকো চেহারার লোকটা পরিচয় দিল 'লক্ষ্মী দে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ'।

'এই গুঁফো চেহারায় এমন লক্ষ্মীমন্ত নাম'! স্বভাবসিদ্ধ ভাবে খেঁকিয়ে উঠেছিল তনিমা।

'আজ্ঞে, লক্ষ্মীকান্ত, ছোট করে লক্ষ্মী'; খিঁক খিঁক হেসে উল্টোদিকের নড়বড়ে কাঠের চেয়ারটায় বসতে বলে ডিটেকটিভ মশাই।

'কার পেছনে ফেউ লাগাতে হবে? স্বামী না বয়ফ্রেন্ড?'

'কি বাজে বকছেন? আমার কিছু ইনফরমেশন চাই'।

'ওই একই হল'।

এরপর সৃজিতের ছবি ও বাইয়োডেটা, সাথে ফি নিয়ে দরাদরি; সব সেরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে পেরেকে লেগে কেপ্রির পেছনটা ফ্যাছাৎ। এটা লোকটার একটা বদমাইশি কিনা বুঝতে পারেনি তনিমা, তবে

পরের বার থেকে বসতে গেলে সাবধান হয়।

ছ্যাঁচড়া হলেও লক্ষ্মী দে কাজের লোক, সৃজিতের বাঁদরামোর অনেক খবরই এনে দিয়েছে সে; লোকে যা বলে মিথ্যে নয়। তবে খবর নয় হাতেনাতে প্রমাণ চাই তনিমার, সেকারণেই আজ দে র অফিসে যাওয়া।

'আপনি এসে পড়েছেন? আমি ফোন করতেই যাচ্ছিলাম' এতদিনে প্রথমবার ব্যস্ততা দেখায় লক্ষ্মী দে। 'সঙ্গে গাড়ী আছে তো? তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়ি',

'কোথায়' তনিমা স্বরে সন্দেহের সুর।

'আরে চলুনই না, কাজটা হেভি রিস্কি হয়ে যাবে, নেহাত আপনি সঙ্গে আছেন তাই।

'স্টেডিয়াম নেবেন ভাই' গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয় লক্ষ্মী। সল্টলেকে স্টেডিয়ামের পেছনের অভিজাত পাড়ায় একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা দাঁড়ায়। সাইন বোর্ড দেখে বোঝা যায় এটা একটা গেস্ট হাউস। একতলার রিসেপশনের অপবয়সী ছোকরাটার সাথে খানিক গুজগুজ, তারপর কয়েকটা পাঁচশর নোট চালান।

'সাহেব দোতলার ঘরে, ডুপ্লিকেট চাবি ম্যানেজ করেছি; আপনি নীচে থাকুন আমি স্যাট করে কয়েকটা ছবি তুলে আনি; বাওয়াল হলে আপনি ম্যানেজ দেবেন' লক্ষ্মীর স্বরে উত্তেজনা।

'আপনি নীচে থাকুন, চাবিটা আমায় দিন' ছোঁ মেড়ে চাবিটা কেড়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা দেয় তনিমা।

দোতলায় নম্বর লেখা কাঙ্ক্ষিত ঘরটা খুঁজে পেতে সময় লাগে না। চাবি দিয়ে দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে চোখে পড়ে মেঝেতে ছড়ানো জামাকাপড় আর বিছানায় দুটো হতভম্ব মূর্তি।

'তুমি!!' সৃজিতের কাতড়ানি অনেকটা তাড়া খাওয়া নেড়ি কুকুরের ডাকের মতই শোনায়। কয়েক মুহূর্ত থমকে যায় তনিমাও, তারপরেই এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা কাপড়ের বান্ডিল উঠিয়ে নিয়ে সদর্পে বাইরে পা বাড়ায়; কি মনে হতে, টেবিলের ওপরে পড়ে থাকা সৃজিতের ঘড়ি আর মোবাইলটাও উঠিয়ে নেয়; এরপর আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

'ডোন্ট ডু দিস প্লিজ তনিমা!' ভেতর থেকে ডুকরে ওঠে সৃজিত।

'চলুন!' সিঁড়ির কাছে অপেক্ষমান লক্ষ্মীকে তাড়া দিয়ে কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে গাড়ীতে ওঠে তনিমা, অনেকদিন পরে হালকা লাগে, মনে মনে ক্ষমা করে দেয় ব্যুটিকের ছেলেটাকে।

***

ছন্দপতন

খানিক্ষণ শ্বাসরোধী নীরবতা, তারপর ফুঁপিয়ে ওঠে রিয়া। রিয়া মুন্সী বছর খানেক হোল সৃজিতের অফিসে চাকরী পেয়েছে, ডেসিগ্নেশান পাবলিক রিলেশান অফিসার, তবে অবস্থার গতিকে বসের সাথে রিলেশানের ভারি উন্নতি ঘটেছে তার।

রিয়ার বয়স সাতাশ, ছিমছাম সুন্দরী; সাজগোজের নিপুণতায় আকর্ষন আরো বেড়েছে। উত্তর কোলকাতার রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই উচ্চাকাংক্ষী, অথচ পড়াশোনায় ধার ছিল না; কলেজ পেরোতেই তাই চাকরীর চেষ্টা। রিসেপশানিস্ট, প্রাইভেট অ্যাসিস্টান্ট, ক্রমে স্মার্টনেস আর চটকের জোরে এই পদন্নোতি। সৃজিতের সাথে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশীদিনের নয়,দরাজ হস্ত বসের আনুকুল্যে এযাবৎ ভালই কাটছিল; তবে আজকের এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে।

'এখন কি হবে?' কঁকিয়ে ওঠে রিয়া।

'আহা, উতলা হয়োনা, আমি তো আছি', সৃজিতের আশ্বাসে কান্না থামায় সে।

'দেখো প্রথমে এদের কাউকে দিয়ে কিছু জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করছি, তারপর তোমায় বাড়ী ড্রপ করে দেবো, হোল তো?'

'আমি বাড়ীতে কি বলব?'

'বাড়ীতে আবার বলার কি আছে?'

‘বা রে! অফিসে গিয়ে হঠাৎ ড্রেস বদল হয়ে গেলো, মা জানতে চাইবে না?’

‘ওঃ, তা বলে দিও তোমার জামায় কফি পড়ে গেছিল, তুমি বান্ধবীর জামা পরেছ’।

‘বান্ধবী কি অফিসে জামা বগলে করে ঘোরে? আর আমারটাই বা গেলো কোথায়?’ রিয়া ব্যোমকেশী কায়দায় বিশ্লেষণ চালায়।

‘ধুর বাবা, বলে দিও না কিছু, এখন ওসব ভাবতে পারছি না’, সৃজিত অবস্থার চাপে গদগদ ভাব বজায় রাখতে পারে না।

এরপর একটা তোয়ালে জড়িয়ে, ইন্টার কমে ম্যানেজারকে হাঁক পাড়ে সে। ‘ব্যাপার কি মশাই, আপনার গেস্ট হাউসের কোনও সেফটি নেই; যে যখন পারছে ঢুকে পড়ছে?’

‘গেস্টহাউসের সেফটি তো আপনাদের মত গেস্টদের কারণেই আর থাকছে না স্যার!’ ম্যানেজার পাকড়াশীও তেড়িয়া হয়ে ওঠে।

এই মূহুর্ত্তে তাকে চটানো ঠিক হবে না ভেবে সুর নরম করে সৃজিত। ‘যাক গে যা হয়ে গেছে। ইয়ে, মানে কাউকে একটু দোকানে পাঠানো যাবে, আছে কেউ?’

‘এই তো মুশকিলে ফেলেন, দেখছি দাঁড়ান’।

‘স্যার আমায় ডেকেছিলেন?’ দরজার বাইরে থেকে জানান দেয় গেস্টহাউসের বয় শিবু।

‘হ্যাঁ দাঁড়াও আমি আসছি’, সৃজিত দরজার ভেতর থেকে সাবধানে মুখ বাড়ায়।

‘শোনো, কাছের মল থেকে এক সেট পুরুষ আর এক সেট মহিলাদের পোষাক আনতে হবে, দোকানের নাম আর সাইজ লিখে দিচ্ছি; দরকার হলে দোকানে গিয়ে ফোন করবে, আমার নম্বর দিচ্ছি’, সৃজিত এতক্ষণে হারানো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। এরপর টেবিলের ওপর থেকে নিজের পার্স আনতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সে। পার্স ছিল প্যান্টের পকেটে, এমনকি গাড়ীর চাবিও, আর যাবার সময় তনিমা মোবাইলটাও নিয়ে যেতে ভোলেনি; কপালে ঘাম জমে ওঠে, মনে মনে তনিমার কাছে হার মানে সে জীবনে প্রথম বার। বাধ্য হয়ে রিয়ার কাছেই হাত পাততে হয়, বসের সাথে বেরিয়ে পার্স বের করতে হওয়ার কথা নয়, তাই তার বাগে ছিল শুধু একটা পাঁচশর নোট, সেটাই অত্যন্ত অনিচ্ছায় বের করে দেয় রিয়া।

‘এ টাকায় কি হবে?’ রিয়ার চোখে জল।

পরিস্থিতি বুঝে উদ্ধারে নামে শিবু, ‘কাছেই একটা হকারদের মার্কেট আছে স্যার, আমরা কেনাকাটা করি, ওখান থেকে এনে দিচ্ছি’; অগত্যা রাজী হয় সৃজিত।

একশ টাকার একটা ফুল ছাপ বার্মুডা আর দুশ টাকার একটা নাইটি নিয়ে ফেরে শিবু আধঘন্টার মধ্যেই, বাকি দুশ টাকা সে নিজেই নিজেকে বকশিস দিয়েছে।

‘এটা পরে বাড়ী যাবো কি করে, অপদার্থ বুড়ো ভাম!’ খেঁকিয়ে ওঠে রিয়া, তার মুখভঙ্গী রীতিমত হিংস্র।

বার্মুডার ওপর গেস্টহাউসের তোয়ালে চাপিয়ে মাথা নীচু করে রিয়ার ধাঁতানি হজম করে নীচে নামে সৃজিত, রিয়ার ফোনেই ট্যাক্সি বুক করতে হয়েছে, তাকে বাড়ী ছেড়ে নিজের বাড়ী গিয়ে ভাড়া মেটাতে হবে। ভাগ্যিস গেস্টহাউসের পেমেন্ট ঢোকার সময় করতে হয়েছিল, মনে মনে ভাবে সে।

‘স্যার ওটা রেখে যান!’ ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে, ম্যানেজার পেছন থেকে হেঁকে ওঠে।

‘তোয়ালেটা রেখে যান স্যার, ওটা নিতে গেলে আলাদা চার্জ’; গা থেকে তোয়ালে খুলে দিতে দিতে লোকটার চোখে মুখে কেমন একটা জান্তব উল্লাস লক্ষ্য করে সৃজিত।

***

রাঁদেভু

‘আজ বিকেলে কি করছিস?’

‘কি আবার করব, রুটি বানাবো, এঁটো বাসন মাজব!’ ফোনে শিবুর আদুরে প্রশ্নের উত্তরে ঝাঁঝিয়ে ওঠে রূপা।

‘সবসময় এতো রেগে থাকিস ক্যানো? একটু ভালো করে কথা বলতে পারিস না?’

‘শোন, এই কাঠ দুপুরে বাগান ঝাঁটাতে ঝাঁটাতে ভালো কথা কিছু মাথায় আসছে না, কি বলার চটপট বলে ফেল’।

‘আজ বিকেলের শোয়ে দুটো টিকিট আছে, শাহ্রুখের বই, সিটি সেন্টারে।‘

‘কি বললি? তুই মলে সিনেমার টিকিট কেটেছিস?’ রূপার স্বরে বিস্ময়ের ঘোর।

‘হ্যাঁরে, তোর কবেকার শখ তাই...’

অফিসের দিনেও মলের চত্বরে বেশ ভালই ভীড়, অল্প বয়সী প্রেমিক প্রেমিকা থেকে মধ্যবয়সী বান্ধবীদের দল, কিম্বা কলেজছুট ছাত্রছাত্রী; মল তো আজকাল অনেকেরই ঘরবাড়ী। চারপাশের চাকচিক্য দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়ায় রূপা, শিবু পাশে পাশে চলে আহ্লাদী পোষা বেড়ালের ভঙ্গীতে। আজকে ভাইয়ের বিয়ের জন্যে কেনা শাড়ীটা পরেছে রূপা, সময় নিয়ে সেজেছে।

‘সবাই তোকে দেখছে টেরিয়ে টেরিয়ে’, শিবু ফিসফিসিয়ে বলে। কথাটা মিথ্যে নয়, এমন বিয়েবাড়ীর সাজে মলে ঘুরে বেড়ালে লোকে তো দেখবেই।

‘চা খাবি?’

‘না থাক, যা দাম!’

‘খা না, এক কাপ দুজনে ভাগাভাগি’, শিবু ঘন হবার চেষ্টা করে।

‘বলছি না দরকার নেই? শুধু শুধু পয়সা নষ্ট’, রূপা তেড়ে উঠতে গিয়ে সুর বদলায়।

এরপর খোঁজাখুঁজি করে হলে ঢোকে দুজনে; শো শুরু হয়ে গেছে, তবে বিজ্ঞাপন চলছে, সিনেমার দেরী আছে। অন্ধকারে কোনওক্রমে সিটে বসে লাইটম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী। ঠান্ডা ঘর, নরম চেয়ার, পাশে গার্লফ্রেন্ড, শিবুর কেমন নেশা নেশা লাগে; আজকের দিনটা হঠাৎ করে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তার।

‘এত আরামে আমার তো ঘুম পাচ্ছে রে শিবু’, রূপা ফিসিফস করে।

‘সে কি রে ঘুমাবি কি তোর শাহরুখের কি হবে তাহলে?’ রূপা চিমটি কাটে শিবুকে, গদগদ প্রেমে।

রূপা মজে আছে সিনেমায়, সময়ের হিসেব থাকে না, কখন যেন ইন্টারভ্যাল হয়ে গেলো;‘বাথরুম যাবো’ শিবুকে নাড়া দেয় সে, একা যাবার সাহস নেই। হাঁচোড় পাঁচোড় করে বেরোতে গিয়ে পাশে বসা এক মহিলার পা মাড়িয়ে দেয় সে।

‘কি হলটা কি দেখে চলুন!’ মহিলার বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য মাঝপথেই আটকে যায়।

‘কি রে তুই? তোর না মা কলতলায় পড়ে গেছে, ডাক্তার দেখাতে হবে!’ চেঁচিয়ে ওঠেন মহিলা। বেগোতিক দেখে শিবু হাত ধরে টানে, কিন্তু মহিলাও ছাড়ার পাত্রী নন।

‘তাই বলি, ডাঁই বাসন পড়ে রইল, রাতের রান্না মাথায় উঠেছে, তিনি পড়িমড়ি করে বাড়ী ছুটলেন, এ কি মায়ের টানে? আজকালকার মায়েরা কি আর অত ভাগ্য করেছে!’

‘মা চুপ করো!’, পাশে বসা কিশোরী মেয়েটি মহিলাকে সামলানোর চেষ্টা করে, মায়ের আচরণে সে খুবই বিব্রত।

‘তুই চুপ কর, তোর আর কি? রাতে রান্না নেই, তাই পিজ্জা মিজা সব আসবে; এদিকে যে বাবার কোলেস্ট্রল, আর আমার ভিএলসিসি, তাতে কি আসে যায়!’

ততক্ষণে চারপাশের লোক এদিকের গোলমালে মনযোগী, সকলেই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। রূপা না যেতে পারছে, না বসতে, শিবুর অবস্থাও তথৈবচ; এর মধ্যেই সিনেমা শুরুর মুখে। সবাই দাবড়ানি দিয়ে থামাতে চেষ্টা করেন মহিলাকে এ অবস্থায়, ‘দিদি, বাড়ীর সমস্যা বাড়ীতেই মেটান, এখানে আমরা পয়সা দিয়ে ফিল্ম দেখতে এসেছি’। অবশেষে ক্ষান্ত দেন তিনি, ফিল্মের দ্বিতীয়ভাগ শুরু হয়। গুটি গুটি পায়ে হল থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে রূপা আর শিবু, নতুন করে শর্বরী বৌদির মুখোমুখি পড়তে চায় না তারা আর।

‘টিকিট কেটে দেখতে এসেছ, পুরোটা দেখে বাড়ী যাবে; আর শোন, কাল সকালে সময়মত এসো’, শর্বরী বৌদি হিসহিসিয়ে দাবড়ানি দেন রূপাকে।

***

ফুল ফুটিয়াছে

‘মা ওয়াস সো এম্বারাসিং, হলের মধ্যে চেঁচামেচি, তুমি জানো না বাবি!’, শর্বরীর সতেরো বছরের মেয়ে তিতলি বাড়ী ফিরে তার বাবার কাছে অভিযোগে আছড়ে পড়ে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রাণের চেয়ে মানের দাম ঢের বেশী, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে; আধবুড়ো বেয়াক্কেলে বাপ মায়েরা সেটা বুঝলে তো!

‘অ্যাই, কি বললি? এম্বারাসিং! ছোটবেলা থেকে খাইয়ে পড়িয়ে পটি সাফ করে বড় করলাম, এখন মা হচ্ছে এম্বারাসিং! তুমি কিছু বলছ না যে বড়?’ শর্বরীও তার বর অনিমেষের ওপর চেঁচায়। আসলে ভালমানুষ অনিমেষ হচ্ছে বালির বস্তা, প্রয়োজনে মা মেয়ে দুজনেই খুব খানিক কিলিয়ে হাতের সুখ করে নেয়; আজকের স্ট্রেসের যুগে ফ্রাস্টেশান বের করার একটা জায়গা চাই তো!

‘আহা, তুমি শুধু মুধু কাজের মেয়ের কারণে রাগ করে নিজের শরীর খারাপ করছিলে, তিতলি সেটাই বলছে।‘

‘তুমি অমনি মেয়ের ঝোল টেনে কথা বলা শুরু করলে? তিনি যে দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছেন, বাড়ীতে কোনও কাজে হেল্প করে আমায়?’

‘হেল্প আবার কি করব, রূপাদি তো সারাদিন থাকে, সব করে; তুমি নিজেও তো সারাক্ষণ ফ্রেন্ডদের সাথে ওয়াটস অ্যাপ কর।‘

‘তোর সাহস দিন দিন বাড়ছে তিতলি, তুই আমার ফ্রেন্ড তুললি!’

‘আহা, ফ্রেন্ডই তো তুলেছে, বাপ-মা তো নয়। এই মামনি তুমি মাকে সরি বলো এক্ষুনি’, মা মেয়ের কুরুক্ষেত্রে অনিমেষ শরশয্যায় খাবি খায়। এরইমধ্যে রাগ করে তিতলি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে।

‘হ্যালো! কিরে ফোন ধরছিলি না কেন?’

‘আরে ধুর ভাল্লাগে না, মা না টোটালি ডিসগাস্টিং!’

‘যাঃ কি যে বলিস, আন্টি ইস আ সুইটহার্ট, যা দারুণ র‍্যাপ্স আর লাসানিয়া বানায়!’

‘হ্যাঁ তুই তো বলবিই, পেটুক কোথাকার।‘ মোবাইলে ফোনাফোনি হচ্ছে তিতলি আর তার বান্ধবী শ্রেয়ার মধ্যে।

‘আচ্ছা ঠিক আছে এত আপ্সেট কেন বল।‘

‘না রে কিছু না এমনি।‘

‘কাম অন কিছু তো নিশ্চয়ই। বাই দ্য ওয়ে, ইন্সটা তে রেহানের আজকের ফোটোটা দেখেছিস? ডেনিম জ্যাকেটে হি ওয়াস হট!’

‘সামনে থেকে হি ওয়াস লুকিং ইভেন বেটার, ছবিটা ভালো আসেনি।‘

‘মানে?’

‘ওকে সিটি সেন্টারে দেখলাম কয়েকটা বন্ধুর সাথে।‘

‘ও তাই বল! তারপর, কথা বললি?’

‘ড্যাম, সেটাই তো প্রবলেম। ওকে দেখলাম একটা কাফেতে, আমি মার সাথে উইন্ডো শপিং করছিলাম। এরপর মুভি হলে ঢুকে দেখি আমাদের পেছনের রো তে বসেছে,ভাবলাম ইন্টারভ্যালে হাই করব’।

‘ওয়াও, এই খবরটা এতক্ষণ চেপে আছিস? তাহলে তো তোর মুড ভালো হওয়ার কথা, এত রেগে আছিস কেন?’

‘সেটাই তো রিয়েল ইস্যু! ইন্টারভ্যাল হতেই মা ডিস্কভারড আমাদের বাড়ীর হেল্প মিথ্যে বলে ছুটি নিয়ে মুভি দেখতে গেছে,আর অমনি রূপাদির ওপর চ্যাঁচাতে শুরু করল বিচ্ছিরি ভাবে; সবাই ঘুরে দেখছিল। তুই ভাব আমার অবস্থাটা! রেহানও তো দেখল! মনে হচ্ছিল ছুটে পালিয়ে যাই।‘ বলতে বলতে অভিমানে তিতলির গলা ধরে আসে।

‘শীট, এটা সত্যিই খুব খারাপ হোল। এনিওয়ে, অত ভাবিস না; তাছাড়া রেহান তো এমনিতেও কাউকে পাত্তা দেয় না, ভেরি স্নব নিজেকে কি যে ভাবে! চল রাখছি’।

শ্রেয়ার শেষের কথাটাতে স্বান্তনা পায়না তিতলি, বুকের ভেতর জমে থাকা পাথরটা নতুন করে ধাক্কা দেয়, বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে সে অজানা বেদনায়। ‘টিং টং’ মেসেজের সংকেত ধ্বনিতে বিরক্ত হয়ে ফোনটা সরিয়ে দিতে গিয়ে মেসেঞ্জারের সদ্য আগত বার্তায় চোখ পড়ে যায়।

‘পিঙ্ক জাম্পসুটে দারুণ দেখাচ্ছিলে আজ’, রেহানের মেসেজটা ফোনের স্ক্রীনে জ্বলজ্বল করে ওঠে।

***

কাসুন্দি

‘রেহান খেতে এস, কি এত সারাক্ষণ মোবাইল মুখে করে বসে থাকো বুঝি না’, রাসভারি প্রফেসর মিসেস অদিতি মুন্সী খাবার টেবিল থেকে হাঁক পাড়েন।

হাতিবাগানের পৈত্রিক বাড়ীর একাংশে অদিতি, শ্যামল আর রেহানের ছোট্ট ছিমছাম সংসার। বাড়ীর অন্দরসজ্জায় স্বাচ্ছল্য ও রুচির যে পরিচয় আছে, তার পেছনে অদিতির অবদানই মুখ্য, সংসার পালনের বাকি সব কাজের মতই এব্যাপারেও শ্যামল শুধুই অর্থের যোগানদার।

‘এবাড়ীতে তো আর থাকা চলে না’, অদিতির এবারের লক্ষ্য টেবিলের উল্টোদিকে বসা শ্যামল।

‘কেন কি হোল আবার?’

‘কি একটা নোংরা পরিবেশ জানোনা? তোমার বড়দার কথা বলছি। চারতলাটা জুড়ে থাকে কিন্তু যাতায়াত তো এই কমন সিঁড়ি দিয়েই, মুখ ফিরিয়ে তো থাকা যায় না’।

‘বড়দা! বড়দা আবার কি করল?’ সরকারী ব্যাঙ্কের ছাপোষা কেরানী নির্মল, চুপচাপ নির্বিবাদি, তিন তিনটে মেয়ের বাবা হয়ে চিরকালই কেমন নুয়ে আছে। সেই নির্মল কি নোংরামি করতে পারে ঠিক কল্পনা করতে পারেনা শ্যামল।

‘কিরকম শ্যাবি ভাবে থাকে বলতো ওরা? রংচটা দেওয়াল, জানলায় শাড়ী কেটে পর্দা; বাইরেটা রং করার কথা বলতে গেলেই তো আতঁকে ওঠে।‘

‘ও তাই বল’, শ্যামল আশ্বস্ত হয়।

‘না সেসব তো এতকাল সহ্য করেই নিয়েছি, কিন্তু বুড়ি, বুড়ির সাজ পোশাকের ঘটা দেখেছ? কোত্থেকে আসে এসব?’

‘আরে, ওতো চাকরী করে; বি-এ পাশ করেই সেই যে গোঁ ধরল, এলেম আছে মেয়েটার’, শ্যামলের মন্তব্য স্নেহের ছোঁয়া।

‘সে নাহয় তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, কিন্তুর আজকের ব্যাপারটা? আজ আমার সকালের দিকে দুটো ক্লাস ছিল, বাড়ী ঢুকছি দেখি ট্যাক্সি থেকে নামছে বুড়ি একটা ফুটপাতের নাইটি পড়ে, গাড়ীর ভেতরে একটা চোয়াড়ে মত লোক বসেছিল, খালি গা, বার্মুডা, কেমন মিস্ত্রী মিস্ত্রী দেখতে’।

‘আরে বাবা মিস্ত্রীরা কি মানুষ নয়?’

‘আমি তা বলিনি, কিন্তু ওই লোকটার সাথে বুড়ি কি করছিল, আর ওই উৎকট পোশাকে? তার তো অফিস যাবার কথা। আমি তো প্রথমে দেখে চিনতেই পারিনি, রান্নার মাসীর মেয়ে বুলান মনে করেছিলাম।’

‘দেখো হয়তো গো অ্যাস ইউ লাইকে নাম দিয়েছিল বুড়ি, হাঃ হাঃ।‘

‘একদম ছ্যাবলামো করবে না তো অসহ্য!’ অদিতি ঝামটে ওঠেন।

‘তা কি করব? বুড়ি কেন ফুটপাতের নাইটি পরেছে সেই নিয়ে দাদার সাথে ঝগড়া করব?’ শ্যামল এতক্ষণে মেজাজ হারায়।

‘আমি মোটেও তা বলছিনা, শুধু বলছি নিউটাউনের দিকে একটা ফ্ল্যাট দেখতে’।

‘ফ্ল্যাটে নাহয় উঠে গেলে, কিন্তু আমার এই অফিস? ক্লায়েন্টরা ওই তেপান্তরে যেতে চাইবে?’ শ্যামল হাইকোর্টের উকিল, সিভিল কেস সামলায়, বাবার আমল থেকেই বাড়ীর একতলায় অফিস, পৈত্রিক সূত্রে ফার্ম ও অফিস দুইই এখন তার।

‘আসলে তুমিই এই পুরোনো পাড়া, রকের আড্ডা এসব ছেড়ে নড়বে না’ অদিতি বিরক্তি ঢেকে রাখতে পারে না।

‘নিউটাউন ইস কুল’, টেবিলে বসতে বসতে রেহান হঠাৎ মন্তব্য করে।

‘তাহলে আর কি, নিউটাউনের ফ্ল্যাটটা তুমিই বরং চাকরী করে কিনো, তদ্দিন নাহয় মা-ছেলে একটু মানিয়ে নাও। যত্তো সব!’ চটপট খাওয়া শেষ অরে টেবিল থেকে উঠে যায় শ্যামল।

খাওয়ার পরে রোজকার মত একটা সিগারেট ধরিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামল, অদিতির কোথায় কষ্ট সেটা যে ও বোঝে না তা নয়, তবু এতকালের শেকড় উপড়ে ফেলতে যে কলজের জোর লাগে, তা বোধ হয় ওর নেই।

‘রাতের খাওয়া হয়ে গেছে?’ সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নির্মল প্রশ্ন করেন।

‘তুমি এত রাতে, অফিস থেকে?’

‘হ্যাঁ রে, আজকাল আমাদের বড্ড চাপ, আগের মত আর নেই’, নির্মলের গলায় ক্লান্তির সুর।

‘ইয়ে দাদা, এইবার বুড়ির বিয়েটা দিয়ে দাও’।

‘বুড়ির বিয়ে!’

‘হ্যাঁ বয়স তো হয়েছে, দেখতে শুনতেও ভালো, ওর পরে তো আরো দুটো, আর দেরী করা ঠিক নয়।‘

‘কিন্তু ও এখুনি বিয়ে করতে চায় না, আমি তো রিংকুর জন্য চেষ্টা করছি’।

‘বিয়ে করবে না এতদূর এগিয়েছে? দাদা, বুড়ি বোধহয় তাহলে একটা মিস্ত্রী না কার সঙ্গে প্রেম করছে, কি জানি বিয়েই করে ফেলেনি তো ভেতর ভেতর?’

‘অ্যাঁ, কি বলছিস তুই?’ নির্মল আঁতকে ওঠেন।

***

কি কেলো!

‘শুনছ, কোথায় গেলে?’ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন নির্মল।

‘কি হয়েছে, এত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?’ স্ত্রী সীমা ব্যাস্ত হয়ে ওঠে।

‘বুড়ি কোথায়?’

‘বুড়ি? ঘরে আবার কোথায়?’

‘ও ইয়ে, মানে ঘরেই আছে তাহলে?’ নির্মল খানিকটা আশ্বস্ত হন।

‘কি ব্যাপার হঠাৎ আজকেই তুমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বুড়ির খোঁজ করছ?’

‘আজকেই মানে? আজকে কোনও বিশেষ দিন নাকি?’

‘সে আর বলতে! যা বিপদ গেলো মেয়েটার ওপর দিয়ে!’

‘সেকি কিসের বিপদ?’

‘ওর মুখ থেকেই শোন সব’, সীমা বুড়ি ওরফে রিয়াকে ডাকেন, অবশ্য বিপদের ব্যাখ্যান মেয়ের বকলমে তিনি নিজেই করেন। রিয়া উল্টোডাঙ্গা থেকে বাস না পেয়ে একটা অটো রিজার্ভ করে সেক্টর ফাইভে অফিস যাচ্ছিল, দত্তবাদ বস্তির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে একটা গর্তে পড়ে অটোটা উল্টে যায়। রিয়া রাস্তায় ছিটকে পড়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে কাদা মেখে একসা, ড্রাইভারেরও চোট লেগেছিল। সেসময় ওখানকার লোকজন

এসে খুব সাহায্য করে, একটি মেয়ে তার নাইটি পরতে দেয় রিয়াকে, মেয়েটির দাদা ট্যাক্সি করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছে একটু সুস্থ বোধ হতে।

'ওঃ খুব বেঁচে গেছিস মা!' নির্মল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

'এত উপকার করল, ওদের ফোন নম্বরটা নিয়েছিস তো? জামাটাও ফেরত দিতে হবে তো, তাছাড়া আমিও একটা ধন্যবাদ জানাতাম'।

'না বাবা, তার দরকার হবে না। মানে আমি ওদের পাঁচশ টাকা দিয়েছি'।

'তাহলেও একটা ধন্যবাদ...।'

'বলছি তো দরকার নেই!' রিয়া বাবাকে দাবড়ানি দেয়।

'ওঃ, আচ্ছা', বর্ষাকালের মিয়োনো মুড়ির মত মেয়ের রায় মেনে নেন নির্মল।

'কেসটা কি?'

'কিসের কেস?'

'বলছি আজকের আসল কেসটা কি?' রিয়ার পরের বোন রিংকু মাস্টার্স করছে বায়ো কেমিস্ট্রিতে, ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়া ভালোমানুষ গোছের; তবে বাইরে থেকে যেটা বোঝা যায় না তা হোল ওর তুখোড় বাস্তববুদ্ধি; বাড়ীর লোকেদের মধ্যে ওকেই রিয়া একটু সমঝে চলে। রিংকুর জেরার মুখে নিজের সাহস বজায় রাখতে চেষ্টা করে রিয়া।

'কি বাজে বকছিস?'

'বলছি নাইটিটা তো সস্তার হলেও ব্রান্ড নিউ, মেয়েটা তোকে কিনে পরতে দিলো বুঝি?'

'কিনে দেবে কেন? ঘরে ছিল, সেই থেকেই দিলো তো'।

'ওঃ! তা, নিজের জামাকাপড় গুলো কি করলি? তুই তো ব্যান্ডেড ছাড়া পরিস না, দান করে এলি?'

'দান করব কেন? বললাম না কাদা লেগে, ছিঁড়ে যাতা হয়ে গেছিল'।

'আচ্ছা দিদি, অটোটা যে উল্টে যাবে, তুই বোধহয় বুঝতে পেরেছিলিস না রে?'

'মানে?'

'না, তোর জুতোয় তো কোনও কাদা টাদা দেখলাম না তাই। নিশ্চয়ই পড়ে যাবার আগে হাতে খুলে নিয়েছিলি বল?' রিংকুর মিচকে হাসিতে পিত্তি জ্বলে যায় রিয়ার, কিন্তু এক্ষেত্রে রাগ দেখালে ধরা পড়বার ভয়।

'যদিও তোকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নেই আমার, তবু বলছি, ওই মেয়েটি আমার জুতো যত্ন করে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।'

'যাক রহস্যের সমাধান ঘটল এতক্ষণে; মেয়েটি জড়িবুটিও জানে কি বল? জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই, অথচ গায়ে একটা আঁচড়ের দাগও নেই', কথাটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে অন্যঘরে চলে যায় রিংকু।

'ভাগ্যিস, বাবা-মা ওর মত বুদ্ধি রাখে না!' মনে মনে ভাবে রিয়া।

'শাওয়ার থেকে তো একেবারেই জল পরছে না দেখছি', বাথরুম থেকে বেরোতে বেরোতে বিরক্তি প্রকাশ করেন নির্মল।

'হ্যাঁ আজকেই এরকম হল, আমি গোলমালে পেরে উঠিনি গো। কাল বুড়ি মিস্তিরি ডেকে ঠিক করাবে বলেছে।'

'অ্যাঁ বুড়ি মিস্তিরি ডাকবে? ন্না না! আমিই বরং খবর দেবো সদানন্দকে', নির্মল তড়িঘরি সমাধান দেন।

'সদানন্দ তিনকেলে বুড়ো, আজকাল ওর হাত কাঁপে'।

'ওই বুড়োই ভালো, কল সারাতেই তো ডাকবে, জামাই তো করবে না', স্বভাববিরূদ্ধ গম্ভীর স্বরে মামলার নিস্পত্তি করেন নির্মল।

***

মৎস্যপুরাণ

'কোনাগুলো তো সব শুকনোই রয়ে গেলো, কি ঘর মুছছিস? বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছিস আজকাল সুভা!' সীমা বিরক্তি প্রকাশ করেন ঠিকে ঝির ওপর।

'তাড়া আছে গো বড়বৌদি, ছোড়দির আজ দুপুরে ডিউটি, বাড়ী আছে'। সুভা প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ মুন্সী বাড়ীতে কাজ করে, সেই ফ্রক পরা বেলা থেকেই; তখন বড়কর্তা বেঁচে, নির্মল শ্যামল ছাত্র। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে, ভাইয়েরা ভিন্ন হয়েছে, তবে সুভা টিঁকে গেছে; আপাতত সে নির্মল আর তার ছোটবোন কমলার ঘরে কাজ করে একই বাড়ীর চারতলা ও তিনতলায়। কমলার স্বামী অসীম ঘর জামাই, মানে উড়নচন্ডী স্বভাবের কারণে নিজের পৈত্রিক ভিটে খুইয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে জুটেছিল শ্বশুরের আমলেই, ভাগ বাঁটোয়ারার সময় তিনতলার একটা অংশ পায় তারা। কমলা গভর্মেন্ট হাসপাতালের নার্স, কর্মদক্ষ ও রাসভারী, তাদের একটি ছেলে ব্যাঙ্গালোরে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, এসবই কমলার বিচক্ষণতার ফল।

'তাহলে তো হয়েই গেলো, দিদিমনির মেজাজের দাপটে সবাইকে তটস্থ থাকতে হবে! বিয়ে হয়ে ইস্তক ছোট ননদের ভয়েই কাঁটা হয়ে রইলাম! বিকেলে এসে দয়া করে একটু সময় দিয়ো', কথাগুলো ছুঁড়ে দেন সীমা দরজা বন্ধ করতে করতে।

'দিদি কি করছে রে?' থলে হাতে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে কথাগুলো বলেন অসীম। পরনে একরঙা লুঙ্গি আর ফতুয়া, উস্কোখুস্কো চুল, ষাটের কাছাকাছি বয়সেও তাঁর হাবভাবে একটা আগোছালো ছেলেমানুষী রয়ে গেছে।

'রান্নাঘরে', সুভা ঘর মুছতে মুছতে উত্তর দেয়।

'ওঃ তাহলে তো হয়েই গেলো, যা এটা দিয়ে আয়, বলবি বেশ রসা রসা করে ঝাল করতে', থলেটা সুভার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন অসীম।

'কি আছে ওতে?' সুভার সুরে সন্দেহ।

'কি আবার! সোনাইয়ের দোকান থেকে ফেরার পথে ফুটপাতে টাটকা চুনো মাছ দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না', অসীমের জবাবে অসীম আত্মপ্রত্যয়।

'ও আমি দিতে পারব না, তুমি নিজেই দিয়ে এসো ছোড়দি কে।'

'কেন রে? এত কি ব্যস্ত তুই?'

'এত আনন্দ করে আনলে যখন নিজেই দাওনা গিয়ে'।

'বুঝেছি, যত্তো সব!', সুভাকে হাত করতে না পেরে, নিজেই গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে এগোয় অসীম, তার মুখে একটা মোলায়েম হাসি লেগে থাকে।

'আজ তোমার একটা দারুণ পছন্দের জিনিষ এনেছি, এই নাও', থলেটা রান্নায় ব্যস্ত কমলার পাশে রেখে কথাটা বলেন অসীম।

'হঠাৎ আমার প্রতি এত দয়া? কি আছে ওতে?'

'কি বল তো? তুমি ভালবাসো'।

'আমি অনেক কিছুই ভালবাসি, তবে সাত সকালে এই আদিখ্যেতাটা নয়। কি জড়ো করলে আবার?'

'ওই একটু চুনো মাছ; খুব টাটকা, রোদ পড়ে রূপোর মত চকচক করছিল একেবারে'।

'চুনো মাছ? তুমি সকাল সকাল চুনো মাছ এনে হাজির করলে?'

'বললাম তো দেখে এত ভালো লাগল...।'

'দেখে ভালো লাগল তো ছবি তুললেই পারতে মোবাইলে, তারপর ফেসবুকে দিতে ফিলিং অসাম উইথ সিল্ভার চুনো! কিনে আনতে কে বলেছিল?'

'দূর ছাই, একটু রসা রসা ঝাল খাব ভাবলাম, তা না বউয়ের মুখের ঝালেই পেট ভরে গেলো', এতক্ষনে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে অসীমের।

‘এই শোন! তোমার মত বাউন্ডুলে অপদার্থর সঙ্গে আমি যে টিকে রয়েছি এতকাল সেটাই ঢের, আবার চুনো মাছ!’

‘কেন তোমার ভাল লাগেনা চুনো?’

‘লাগে, একশ বার লাগে, যদি নিজে রেঁধে খেতে না হয় তখন। এখন বসে বাছবে কে এই জঞ্জাল?’

‘ছোড়দি, আমি বেছে দেব? মানে জামাইবাবু বড়মুখ করে আনলেন’, সুভা রান্নাঘরের একপাশে এসে দাঁড়ায়।

‘জামাইবাবুর প্রতি দরদ উথলে উঠছে দেখছি! ঘরের কাজে তো এত আগ্রহ দেখি না কখনও। মাছ বাছার বাহানায়, বারান্দা সিঁড়ি সব বাদ দিবি, তোকে জানিনা আমি?’

‘এই জন্যে কারো ভালো করতে নেই, তোমার সুবিধের কথা ভেবেই বলা, যে ভাবে সমানে খুঁড়ছ লোকটাকে!’

‘কি বললি, আমি খারাপ? আর এই বেয়াক্কেলে বুড়োটা খুব ভালো? এত ভালো তো নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে রোজ চুনো মাছ গেলা’।

‘এবার থামবে তোমরা? দরকার নেই, আর বানাতে হবে না ঝাল, আমি চললাম!’ দুই মহিলার চেঁচামেচির মাঝখানে থলেটা উঠিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে হাঁটা দেন অসীম।

‘খুব হয়েছে, থলেটা রাখো এখানে, হাড় হাভাতে বুড়ো! চা দিচ্ছি, দয়া করে পা ধুয়ে ঘরে বসবে। অ্যাই সুভা, মাছটা তাড়াতাড়ি ছাড়া!’ অভ্যস্ত স্বরে হুঙ্কার দেন অসীম গৃহিনী।

***

শেষ অঙ্ক

‘উঃ বাবারে, পিঠটা যেন ফেটে যাচ্ছে! আয়া দিদি একটু ডাক্তারবাবুকে ডাকো না গো!’ হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছে সাধনবাবুর স্ত্রী সুনীতা; গতকাল গল ব্লাডার অপারেশান হয়েছে তার।

‘এমন চিল্লালে আমরা তো দু চোখের পাতা এক করতে পারছি না, ঢং যত!’ পাশের বেডের এক পাকাটে চেহারার বৃদ্ধা ঝামটে ওঠেন।

‘নিজের তো মোটে হার্নিয়া, আমার কষ্ট বুঝবে কি করে?’ সুনীতা পাল্লা দেয়।

‘কি! আমার অসুখ তোর চেয়ে কম? শরীরের খোঁটা দিলি, তোর খাই না পড়ি র‍্যা?’ বৃদ্ধার খোনা গলার চিৎকারে আশে পাশের সকলেই তটস্থ হয়ে পড়ে।

‘কি ব্যাপার? এত যদি অপারেশানের শখ, দুজনেরই কিডনি আর লিভার কেটে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি!’ ওয়ার্ডে রাউন্ডে ব্যস্ত কমলার বাজখাঁই হুঙ্কারে খিটখিটে বুড়িও বমকে যায়।

‘এখুনি ভিসিটিং আওয়ার শুরু হবে, কোনো বেয়াদপি শুনি না যেন!’ সবাইকে সচকিত করে রায় দেন রাসভারী কমলা ম্যাডাম।

‘তুমি একা এলে, বুলা এলোনা?’ সাধন বাবুকে ভিসিটিং আওয়ারে প্রশ্ন করে সুনীতা।

‘আমি তো অফিস থেকে এলাম, ও বাড়ী সামলাচ্ছে, বাচ্চা মেয়ে একাই রান্নাবান্না করছে।‘

‘তো মাথা কিনে নিয়েছে। বাচ্চা আবার কি? প্রেম করার বয়স হয়েছে, রান্না করার নয়?’ হিসহিসিয়ে ওঠেন সুনীতা, মেয়ের প্রেমপর্বের কেলেঙ্কারী এখনও ভুলে উঠতে পারেননি তিনি।

‘বুঝি না বাবা, তখন মেয়ের হয়ে নিজেই সালিশী করলে, আর এখন উঠেপড়ে পেছনে লেগেছ। চুকেবুকে গেছে তো সব, এবার ছাড়ান দাও মেয়েটাকে।’

‘যা মিটমিটে মেয়ে তোমার! কেমন সন্দেহ হয়’, সুনীতা বিড়বিড় করেন খানিকটা নিজের মনেই।

‘সকাল বেলা বিল্টু এসেছিল, সঙ্গে একটা রোগা মতন মেয়ে, বলল ওর দোকানে কাজ করে। মেয়েটা টিফিন বাটি করে ঝিঙ্গে পোস্ত বানিয়ে এনেছিল,স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। নিজের মেয়ের খেয়াল নেই মার খাওয়া দাওয়ায়, পরের মেয়ে মনে রেখেছে ঠিক’, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনীতা।

‘বাঃ, খুব ভালো, এখন বিশ্রাম নাও। আমি ডাক্তার বাবুর সাথে কথা বলে দেখি কবে ছাড়বে’, সাধন বাবু বিদায় নেন।

রাত বাড়ছে তবু ব্যস্ত বাজারের ভীড়ে কমতি নেই, সাধন বাবু বাস থেকে নেমে চট করে বাজারটা সেরে নিচ্ছেন বাড়ী যাবার জন্য টোটো ধরার আগে। বুঝে শুনে নিতে হবে সব্জি, মেয়েটা তো সবকিছু বানাতে পারবে না। হঠাৎ করে বুকে ওপর একটা ধাক্কা, একটা ছোকড়া তাঁকে পাশ কাটিয়ে সাঁ করে ভীরের মধ্যে হারিয়ে গেলো।

সাধন বাবু আবার সব্জিতে মন দেন, ‘কত হোল?’

‘দুশো পনারো দাদা’। পার্স বের করতে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বুক ধড়ফর।

‘কি হল দাদা?’

‘পার্সটা পাচ্ছিনা ভাই’, দিশেহারা সাধন বাবু ততক্ষনে সারা শরীর হাতরাচ্ছেন; এর মধ্যেই টের পেলেন, বুক পকেটের মোবাইলটাও গায়েব হয়েছে। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে, আশেপাশের লোক সচকিত হয়।

‘স্যার আপনি আমার সাথে আসুন’, ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসে পল্টন ওরফে প্রণব চন্দ্র গুছাইত।

‘তুমি! আবার এসে জুটেছ!’ সাধন বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন।

‘কিছু হয়নি দাদারা, চিন্তা করবেননা আমি ওনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি। কাকিমার অসুখে একটু ঘেঁটে আছেন’, ভীড়ের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে সাধন বাবুকে একপ্রকার টেনেই গলির মুখে নিয়ে যায় পল্টন।

সেখানে একটা ঝকঝকে নতুন টোটো দাঁড়িয়ে, ড্রেনের পাশে অন্ধকারে এক হাড়গিলে ছোকড়া পাংশু মুখে অপেক্ষায়।

‘ক্ষমা চা ছেনো! স্যার বাচ্চা ছেলে, এবারকার মত ক্ষমা করে দিন’, কথাটা বলে ছেনো নামের ছোকড়ার হাত থেকে পার্স আর মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে সাধন বাবুর হাতে তুলে দেয় পল্টন।

‘গুনে নিতে পারেন স্যার, তবে গড়মিল পাবেননা। ছেনো তুই যা।’ সাধন বাবু হতভম্ব, ব্যাপার কিছুই বোধগম্য হল না; সব কিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় পল্টন নিজেই।

‘ট্রিপ সেরে ভজার দোকানে চা খাচ্ছিলাম স্যার, সে সময় আপনাকে দেখলাম বাজার করছেন, আর তারপরেই দেখি ছেনোর কীর্তি। সাঁ করে পিছু নিয়ে লেঙ্গী মেরে কাত করলাম ব্যাটাকে ড্রেনের ধারে; আপনি আমার ইয়ে জেনে অবশ্য খুব দুঃখ করল।

‘ইয়ে, কিসের ইয়ে?’ সাধন বাবু আঁতকে ওঠেন।

‘গেলো মাসে চাকরীতে রিজাইন দিলাম স্যার, বুলা দিব্যি দিয়েছিল বুঝলেন না? তা মালিক আমার মাটির মানুষ। বলল পল্টন, অন্য চাকরীতে পিএপ টিএপ কত কিছু, তা আমি তো আর সেসব পারলাম না। তবে তুই পাঁচ বছরের ওপর কাজ করলি, গ্যাচুইটি তোকে আমি দেবো।’

‘চুরির চাকরিতে গ্রাচুইটি?’ সাধনবাবু বাক্যহারা।

‘অমন করে বলবেন না স্যার, চাকরী তো চাকরীই, সে খাতা লেখারই হোক আর মাল সরাবার। তা, খাতা লেখা বাবুরাই কি আর মাল সরায় না স্যার?’

‘তা এখন তোমার চলছে কি করে?’

‘ওই গ্যাচুইটি, তার সাথে কিছু জমানো ছিল, আর বুলার একজোড়া কানের দুল, সব মিলিয়ে টোটো, পারমিট; এই রুটেই চালাই স্যার। চালপট্টির ঘনাদা আমায় হেভি ভালবাসে, সেই ব্যাবস্থা করে দিল’।

‘বুলার কানের দুল?’ সাধন বাবু দুলে ওঠেন।

‘চলুন বাড়ী পৌঁছে দি’, আর কথা না বাড়িয়ে সাধন বাবুকে নিয়ে টোটো হাঁকায় পল্টন, গোলমালের মধ্যেও সব্জিওয়ালার থেকে বাজারটা নিতে ভুল হয়নি তার।

‘ইয়ে, তোমার কাকিমা সুস্থ হলে এসো একদিন’, বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে পল্টনকে উদ্দেশ্য করে বলা কথাটা নিজের কানেই আশ্চর্যের ঠেকে সাধনবাবুর।